উৎসর্গ

প্রদ্যোৎ গুহ
জগন্নাথ চক্রবর্তী
সুনীল ঘোষ
যাদের অনুবীক্ষণে আমার যৎসামান্য
অনতিসামান্য সার্থকতা পেয়েছে।

স. অ.

এই লেখকের লেখা

বইপড়া

মার্ক্সীয় দর্শন

মার্ক্সীয় যুক্তিবিজ্ঞান

বিষয় সূচী

কাল ও রুচি

যে কোনো বই সম্পর্কে যে মন্তব্য অনায়াসে করা যায় তা হচ্ছে বইটা আমার ভালো লেগেছে কিংবা ভালো লাগে নি। কিন্তু হলফ করে আমরা এ মন্তব্য করতে পারি কি? কেউ কি পারে? একটু ঘুরিয়ে যদি বলি, প্রশ্নের সীমানাটাকে যদি আরও একটু বাড়িয়ে দিই, তাহলে জিজ্ঞাসাটা দাঁড়াবে—জীবনের প্রতিটি পর্বে যে কোনো একখানা বই কি আমাদের সমান ভালো লাগে, অথবা সমান মন্দ? শুধু বই নয়, যে কোনো জিনিস সম্বন্ধে আমাদের অনুরাগ কি বিরাগ আজীবন সব সময় একই রকম থাকে? থাকে, এ কথা হলফ করে বলতে পারি না।

আমরা যারা বই পড়ি, বই পড়তে ভালোবাসি, তাদের সকলের জীবনেই, রুচির পরিবর্তন ঘটে থাকে। কাল এবং রুচির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বার করা তাই একটা অতি পুরাতন সমস্যা। হয়তো এমনধারা কোনো যোগসূত্রই নেই। কিংবা হয়তো একান্ত ব্যক্তিগত স্তরেই **আমার** কাল এবং **আমার** রুচির মধ্যে একটা সাযুজ্য রচনা করা সম্ভব। 'কাল' শব্দটি অবশ্য এখানে ইতিহাস-সিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করছি না, যদিও এই অর্থের গুরুত্ব আছে এবং ইতিহাসের একটা দেশ-কাল চিহ্নিত খণ্ডাংশ জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, রঙে রসে সঞ্জীবিত করছে এই মর্ত্যলোকে পঞ্চাশ বছর বসতি করার অভিজ্ঞতাকে। কিন্তু সে অর্থে **আমার** কাল তো আমার একলার নয় এবং **আমার** রুচিও নয় একান্ত

আমার। আমি যদি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে থাকি, অন্যেও বেসেছে। অন্যদের আর আমার ভালো লাগার একটা যদি গড় কষতে যাই তাহলে অনেক বই ও অনেক লেখককেই সে তালিকায় জুড়তে হবে। তবু একথা চোখ বুজে বলতে পারি না, সব পড়ুয়া এবং সব রবীন্দ্রভক্তদেরই ভালো লাগাটা একই স্তরের। আর সেক্ষেত্রে পুরোনো প্রশ্নটাতেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হয়, —অতি অন্তরঙ্গ অর্থেই আমার রুচি একান্ত আমারই কি না? জানি, আমার বা অন্য যে কোনো ব্যক্তির এই মৃদু অহমিকা পরিসংখ্যানের ধোপে টিকবে না। রবীন্দ্ররসিক ও অনুরাগীদের সহস্রের মধ্যে আমি মাত্র এক। আমরা যে সাংস্কৃতিক ভাবমণ্ডলের মধ্যে বাস করছি এবং যা আমাদের সত্তাকে পুরোপুরি অধিকার করে আছে আমার গড়পড়তা রুচি তারই ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র। তবে এ হিসাব গাণিতিক মাত্র নয়। ভগ্নাংশ হলেও আমার বা যে কোনো ব্যক্তির রুচির মধ্যে কিছুটা নিজস্বতা থাকে। অর্থাৎ গড় পড়তা হিসাবে আমরা সব এক স্তরের কিন্তু কখনো একাকার নই।

একটু সংকোচ বোধ করছি, তবু একথা না বলে পারছি না যে সাহিত্যরুচি প্রথমত একান্তই আত্মমুখ সংবেদনশীল একটা গুণ। কালক্রমে এর বিকাশ অথবা লয় হয়, বদলে যায় কিংবা দাঁড়িয়ে যায় একটা অভ্যাসে। দেখা যাক, কেমন করে এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পুস্তক-সচেতন। হয়তো একথাটা মোটেই সত্য নয়, যদিও এরকম মনে করতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। যাই হোক, ভালো মন্দ, না-ভালো না-মন্দ, সব রকম বই-ই কোনো-না-কোনো সময়ে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত করতে পারে। সিনেমা, রেডিও, খবরের কাগজ বা হয়তো ক্লাবে বা বন্ধুদের আড্ডায় কথাচ্ছলেও কোনো মন্তব্য শুনে আমরা একটা বইয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারি। উপন্যাস বা গল্প, কোনো কোনো নাটক বা লঘু নিবন্ধ চট করেই আমাদের

মনকে টানে। বইয়ের জগৎ বিশাল এবং সকলেরই তাতে প্রবেশাধিকার আছে। বই নেই এমন একটা দুনিয়ার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। কিন্তু এমন পাঠক ঢের আছেন যাঁরা পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটি তলিয়ে বিচার করার তাগিদ অনুভব করেন না।

এই নিবন্ধের সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি হিসাবে পাঠকের রুচি পাঠকের জীবনের নানা স্তরে ও নানা পর্বে কী ভাবে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে কিংবা বদলে যায়। উদাহরণ দিয়ে বলি, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়ে ('আবৃত্তি করে' বলাই হয়তো আরো যথার্থ) যে উত্তেজনা অনুভব করতাম আজ আর তা করি না। 'বিদ্রোহী' কবিতা যখন প্রথম পড়েছিলাম তখন তার বায়রন-সুলভ বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের সুরটি সঙ্গে সঙ্গে শিরায় শিরায় সংক্রামিত হয়েছিল, আবেগে মন ফেঁপে-ফুঁসে অগ্নিগিরির বিস্ফোরণের মতো যেন ফেটে পড়তে চেয়েছিল। এখন আর এ কবিতা মনে ঠিক সে রকম কোনো আবেগ সৃষ্টি করতে পারে না। এখন এ কবিতাকে মনে হয় বক্তৃতাগন্ধী; পুনরুক্তিদুষ্ট। কথাগুলি হয়তো কড়া শোনাচ্ছে, তবু বই সম্পর্কে মন খুলে কথা বলাই ভালো। তাই বলতে হচ্ছে অনেক বই—গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এককালে খুব ভালো লাগত অথচ এখন আর তা লাগে না। একথা শুধু বিশেষ কোনো একজন লেখক, একজন কবি বা ঔপন্যাসিক সম্পর্কে সত্য তা নয়—অনেক লেখক এবং কোনো কোনো লেখকের কোনো কোনো লেখার সঙ্গে আর আমরা মন দেয়া-নেয়া করতে পারি না। হয়তো আমরাই বুড়ো হয়ে পড়ি কিংবা হয়তো ঐ সব লেখক বা ঐ সব লেখাই পুরোনো হয়ে যায়; কিংবা হয়তো এর কারণ খুঁজতে হবে অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে —ঠিক কোথায় যে তা আমরা জানি না। তবু, কালের শীতল

নিশ্বাস যে আমাদের রুচিকে বিবর্ণ করে দেয়, বদলে দেয়, এ-সত্যকে না মেনে উপায় নেই।

একজন পাঠকের মনে যে-প্রতিক্রিয়া হয় এবং তার রুচির যে-পরিবর্তন ঘটে—সাধারণ একজন পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাই লিপিবদ্ধ করছি। সাধারণ পাঠক বলতে তাঁদের কথাই বলছি যাঁরা শুধু পড়তে ভালোবাসেন বলেই পড়েন। সাধারণ পাঠক এলোমেলোভাবে হাতের কাছে যা পান তাই পড়েন—পড়া সম্পর্কে কোনো নীতি বা পরিকল্পনার ধার তাঁরা ধারেন না। সাধারণ পাঠক বা গ্রন্থরসিক বা সাহিত্যরসিক যা পড়েন তা থেকে আনন্দ ছাড়া আর কিছু চান না। আর মোটের উপর তাঁরা ভুল করেন না। কোন্ বই তাঁরা পড়তে ভালোবাসেন তা অবশ্য প্রধানত ব্যক্তিরুচির উপর নির্ভর করে। তার মানে এই নয় যে, ব্যক্তিরুচি একান্তই ব্যক্তিগত অর্থাৎ তা ব্যক্তির মধ্যে আপনাতে আপনি বিকাশ লাভ করে এবং তার কোনো পরিবর্তন হয় না। রুচি একটু একটু করে তৈরী হয় এবং তা বদলায়ও। কোনো একটা লক্ষ্য সামনে রেখেও রুচির চর্চা করা সম্ভব। এই মুহূর্তে রুচি-গঠনের সমস্যা অথবা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না। আসল কথা এই, যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন বা যাঁদের সাহিত্যিক বা গবেষকের দৃষ্টি নেই তাঁদের রুচির রকমারিত্ব দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

রস আস্বাদন এবং রুচির ব্যাপারে সত্যিই কোনো নৈর্ব্যক্তিক সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড নেই। সাহিত্যের রসাস্বাদন এমনই সূক্ষ্ম এবং আত্মমুখীন ব্যাপার যে—অমুক বইটা ভালো কেননা এটাই ভালো হওয়া উচিত—সহজে এ-মত পাঠককে গেলানো যায় না। এমন কি খারাপ বই, বা যে-বই আমরা খারাপ বলে মনে করি, অনেক পাঠক তাও গোগ্রাসে গিলে থাকেন। এতেও অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না। পরিসংখ্যান দেখে জানা যায়, ডিটেকটিভ

বা 'বেস্ট সেলর' বই-এর কাটতি বেশী—কিন্তু তা দিয়ে ঐ বইগুলির ভালোত্ব প্রমাণিত হয়ে যায় না। কোন্ বইকে কাল বা সমাজ ম্লান করতে পারে না আর কোন্ বই মরসুমী ফুলের মতোই মরসুমী তার কিন্তু একটা সহজ পরীক্ষা আছে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও ব্যক্তিরুচি প্রভাব বিস্তার করে এবং কালোত্তীর্ণ গ্রন্থও অনেকের কাছে মূল্যহীন বলে মনে হতে পারে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' কি সত্যিই ভালো বই, অন্তত সেকালে যতোটা ভালো বলে মনে হত ততটা কি ভালো? উদাহরণটা হয়তো একটু একপেশে হল, কেননা, রাজনৈতিক উপন্যাস সাধারণতই কালচিহ্নিত। কিন্তু ভিকটর হুগোর 'নাইন্টিথ্রি' বা মাকসিম গর্কির 'মাদার' সম্পর্কে তো সে-কথা বলা চলে না।

সময়ের দূরত্ব কোন্ বইয়ের জৌলুস হরণ করে তা নির্ণয়ের সহজ পরীক্ষার কথাতে ফিরে আসা যাক। কোনো কোনো পাঠকের কাছে বই একটা সাধারণ ভোগ্যদ্রব্য মাত্র—সাপ্তাহিক চা-চিনির বরাদ্দের মতো বইয়ের বরাদ্দও এরকম পাঠক সংগ্রহ করে থাকেন। সাধারণ পাঠক পড়েন বটে, কিন্তু অভ্যাসের তাগিদে যে উপন্যাস, গল্প বা নাটক একবার পড়েছেন কদাচিৎ তা দ্বিতীয়বার পড়েন। এখানেই সাধারণ পাঠকের সঙ্গে রস-পিপাসু সাহিত্য-সমালোচকের তফাত। একজন সমালোচকের কথাই উদ্ধৃত করা যাক: **"অন্যেরা শুধু পড়েন, সাহিত্যের কারবারী বারবার পড়েন।** যে ব্যক্তি অডিসি বা ম্যালরি বা বসওয়েল বা পিকউইক পড়েন নি তাঁর কিছু-একটা হবার আশা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেন তিনি ও-সব বই পড়েছেন এবং একথা বলেই ধরে নেন দায় শেষ হয়েছে, তাঁর (অন্তত সাহিত্য-ব্যাপারে)* কিছু হবার আশা নেই। একথা শুনলে মনে হয় কোনো লোক যেন বলছেন, একদিন স্নান করেছিলাম, বা একদিন ঘুমিয়েছিলাম, বা একদিন প্রেয়সীকে চুম্বন করেছিলাম, বা একদিন বেড়াতে

গিয়েছিলাম।” ধরুন, কোনো পাঠক যদি বলেন তিনি একবার শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন এবং ঐ একবার পড়াই যথেষ্ট তাহলে বুঝতে হবে তাঁর রুচির কোনো গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সেরা বই একাধিকবার না পড়ে থাকা যায় না। তবে দ্বিতীয়বার পড়তে গেলে এঁদেরও কোনো কোনো বই সব পাঠককে হয়তো সমানভাবে নাড়া দিতে পারে না। ব্যক্তিগত কারণ এবং কালানুষঙ্গ পাঠকের রসগ্রহণের ক্ষমতাকেই প্রভাবিত করে। তবে যে বই একবার পড়ি এবং পড়েই ভুলে যাই তা নিয়ে কেউ প্রশ্নও করে না আর তা নিয়ে জবাবদিহির দায়ও তাই থাকে না। পর পর এড্‌গার ওয়ালেসের আশিখানা বই কেন পড়েছি ? এর কৈফিয়ৎ সহজেই দিতে পারি। সেই সময়টায় ইংরেজ সরকারের রক্ষণাবেক্ষণে কিছুকাল একেবারে একলা থাকতে হয়েছিল, আর হাতের কাছে অন্য কোনো বই ছিল না। তাছাড়া ফ্যাশানের দাবি মিটাতে গিয়েও কোনো কোনো বই পড়তে হয়, এবং সে-পড়া পরমুহূর্তে বেমালুম ভুলে যাবার জন্যেই। এ সব ঘটনা অবশ্য রুচির ক্ষেত্রে কোনো জটিল সমস্যা দাঁড় করায় না।

আসল সমস্যা দাঁড়ায় সেই সব বই নিয়ে, সেই সব উপন্যাস, গল্প, কবিতা এবং নাটক নিয়ে, যা তরুণ বয়সে আমাদের শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে কিন্তু এখন যা তেমনি করে আমাদের মনকে নাড়া দেয় না। একজন সমালোচক প্রশ্ন করেছেন, “এমন বই কি নেই যা একদিন আমাদের রোমাঞ্চিত করেছে....অথচ এখন আমাদের বিচারে যা মূল্যহীন ?” এককালে মারি করেলি, শ্রীমতী হেনরি উড বা হল কেইনের বই পড়ে যে আনন্দ পেয়েছি আজ সে-কথা মনে হলে সাহিত্যের চমৎকারিত্বের পরীক্ষার প্রতি অনাস্থাই আসে। সে সময় ঐ সব বইকে মনে হয়েছিল অপূর্ব, অতুলনীয়। কিন্তু আজ অন্য কথাই মনে হয়। কেন যে হয়

সে-কথা বলা অবশ্য সহজ নয়। প্রশ্নটা কি শুধু পাঠক-মনের পরিণতি-অপরিণতির? একথা হলফ করে বলতে পারি না, যে-বই এখন আর পড়বার ইচ্ছা হয় না তা পড়ে একদিন যে-রস পেয়েছিলাম তা একবারেই ভুয়ো আর তা আমারই অপরিণত মনের সাক্ষ্য। একটা বিশেষ বই—উপন্যাস, গল্প, কবিতা ইত্যাদি পড়ে নানা সময়ে তাঁদের মনে কি কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে কজনে তা খতিয়ে দেখবার তাগিদ অনুভব করেন জানি না। ডি. এল. রায়ের নাটকের তীব্র বক্তৃতাপ্রবণ সংলাপ কি একদিন আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে নি? কিন্তু এখন তা আমাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বা ভারতী-গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের গল্প-উপন্যাস আজ আর কারো কি মনে আছে? অথচ একদিন তা কি আমাদের রোমান্টিক বাসনাকে তৃপ্ত করে নি? ছিলেন তো জলধর সেনও—ভালোমানুষ আর গল্পকে মহৎ পরিণতির উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে যেতে সিদ্ধহস্ত। কে আজ মনে রেখেছে তাঁর 'অভাগী' ও 'বিশুদাদা'র কথা?

গতযুগের জনকয়েক নারী ঔপন্যাসিকের একটি কি দুটি বইয়ের নাম অবশ্য এখনও শোনা যায়, কিন্তু তা প্রধানত মঞ্চ ও চিত্রনাট্যের উৎস হিসাবেই। তাঁদের কোনো কোনো বই লোকে একেবারে বেমালুম ভুলে গেছে, যদিও এককালে বাঙলা সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে এসব বই মারি করেলি বা হল কেইনের মতোই চিত্তাকর্ষক ছিল। একথা বলতে চাই না যে একদা-জনপ্রিয় এইসব লেখকের বই পড়ে একসময় যে-আনন্দ পেয়েছি তা 'ঈসথেটিক' আনন্দই নয়। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন অতিনাটক—মেলোড্রামা, জাঁকজমক, রহস্য এবং ভাবালুতার উপর দুর্দমনীয় আকর্ষণ থাকে। এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র চেয়ে 'মানসী' বা 'কড়ি ও কোমল' আমাদের অনেক বেশী অভিভূত করে। রুচির মধ্যে এই যে তারতম্য দেখা যায়,

একে কিন্তু অপরিণতি থেকে পরিণতিতে উত্তরণ বলা যায় না। সব ভালো বই—উপন্যাস, গল্প, কবিতা বা নাটক জীবনের সর্বস্তরের উপভোগ করা যায় না। মনের মধ্যে কল্পনা যখন প্রথম দল মেলতে শুরু করেছে তখন হয়তো এক ধরনের বই উপভোগ করেছিলাম। সে ছিল নিজের চিত্তবৃত্তিকে আবিষ্কার করার, পরিশীলিত করার আদিপর্বে, সে সময় প্রচুর ভাবরসে ঢল-ঢল বই-এর আকর্ষণ বোধহয় অস্বাভাবিক ছিল না, অথবা নিরর্থক হয় নি। বই-এর কাছ থেকে আমরা ততটুকুই পেতে পারি, যতটুকু আমাদের নেবার ক্ষমতা আছে বা যতটুকু আমরা নিতে প্রস্তুত। অন্য কথায় শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের এক এক জীবন-তরঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বই। কিন্তু আবার এমন বইও আছে যা বয়সের, কালের সীমানা মানে না—আর এই রকম বইকেই শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, বিস্ময়ে আমরা ক্লাসিক বলে চিহ্নিত করি।

তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে ভালো বই ও ভালো লেখা বেছে নেবার মতো রুচিটা পাঠকের মধ্যেই জন্মায়—আবার অনেক সময় জন্মায়ও না। হালকা, থসথসে ভাবপ্রবণ উপন্যাস, বক্তৃতাগন্ধী কবিতা বা চটকদার বিষয় নিয়ে মরসুমী লেখার জনপ্রিয়তার দিকে তাকালেই এ কথার যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। "ভাবপ্রবণ কবিতা, সস্তা নভেল, সস্তা ছবি বা চটুল সুরের যাঁরা ভক্ত তাঁরা তাতে যা আছে ঠিক ততটুকুই উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু ভালো শিল্পকর্ম থেকে যে-আনন্দ পাওয়া যায়—এদের আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে না। এ আনন্দে নেই উত্তাপ, এ শুধু তুচ্ছতা, শুধু অভ্যাসের দাসত্ব। এসব বই তাঁদের ভাবায় না, তাঁদের মনকে অধিকার করে রাখে না। এই সস্তা আনন্দকে—আর মহৎ ট্রাজেডি বা অনির্বচনীয় সঙ্গীত মানুষের মনে যে-পুলক সঞ্চার করে তাকে—একই 'উপভোগ' শব্দটি দিয়েই নামাঙ্কিত করলে কথাটিকে নিয়ে 'পান' (pun) করা ছাড়া আর কি হতে পারে? আমাদের

হাতে এখনও এমন কোনো প্রমাণ নেই নিকৃষ্ট শিল্পে যে গুণাগুণ আছে তা উৎকৃষ্ট শিল্পের কোনো একটি গুণেরও সমকক্ষ। নিরেস আর্ট আনন্দ যে দেয় না তা নয়—কিন্তু সে আনন্দের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।....কথাটা হচ্ছে এই যে নিরেস আর্ট নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—যেমন ঘামায় সত্যিকারের ভালো আর্টের জন্য।"

সে যাই হোক, ভালোমন্দ সব ধরনের বই সম্পর্কেই পাঠকের মনোভাব বদলায়, অনুরাগ-বিরাগের রকমফের ঘটে। আর এ পরিবর্তন শুধু যে পাঠকের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়—সাহিত্যের চলতি হাওয়াও একসময় বদলে যায়। কাল থেকে কালান্তরে রুচির ক্ষেত্রে কতকগুলি মোটাদাগের পরিবর্তন ঘটে যায়। জীবনের মতো সাহিত্যেও এমন একটা জিনিস অহরহ ঘটছে যাকে পেণ্ডুলামের দোলার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আমরা যদি বলি পাঠক নিজেই সেই পেণ্ডুলাম, তবে প্রশ্ন উঠবে—পেণ্ডুলাম দোলায় কে? এক ধরনের বই থেকে আর-এক ধরনের বই-এর প্রতি পাঠকের রুচি আকৃষ্ট হয় কি করে? কখনও বা মোহমুক্তির তাগিদে, কখনও বা ক্লান্তিতে, কখনও বা নেতির আকর্ষণেই দোলা লাগে পেণ্ডুলামে। আর যখন একটা সর্বব্যাপী সিনিসিজম আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করে আর তখন এরগুই দ্রুম বলে মর্যাদা পায়—যে বইয়ে বলার কথা কিছু নেই, নেই কোনো বিশ্বাস বা মূল্যবোধ তারই জনপ্রিয়তা বাড়ে চক্রবৃদ্ধিহারে। তারপর আবার হয়তো পেণ্ডুলাম অন্যদিকে ঝোঁকে, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আবার ফিরে পায় মর্যাদা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কাল ও রুচির নির্ণায়ক নয় আধুনিকতা। যে বই আজ প্রকাশিত হল তা হয়তো দেখা যাবে বস্তাপচা পুরোনো মাল। আবার কোনো কোনো পুরোনো বই পড়তে গেলে মনে হবে যে আমাদের সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার মতোই তা তাজা এবং জীবন্ত। (১৯৫৭)

সমালোচনার সূত্র

"যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেলো, তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে,

তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।
যুগ যুগান্তর চলে যায়।"

সাহিত্য সমালোচনার সূত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ক-লাইন কবিতার সম্পর্ক কী, সে প্রশ্ন অনেকের মনে উঠতে পারে। সম্পর্ক যে কী তা বুঝিয়ে বলা সহজ নয়। তবু সাহিত্যের কথা, তার মূল্য বিচারের কথা ভাবতে গেলেই মনের মধ্যে ঐ কটি লাইন গুন্-গুনিয়ে উঠছে; অনেক বিচার এবং ব্যাখ্যা, তত্ত্ব আর তর্ক যুগে যুগে বারবার লিখে লিখে বারবার মুছে ফেলা হল। এখনও হচ্ছে। আর বিস্ময়ে, সংশয়ে, অসন্তোষে, আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জর হয়ে তাই বার বার প্রশ্ন উঠছে,

"হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে ?"

এ বড়ো কঠিন্ প্রশ্ন। সাহিত্য সমালোচনার সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে যুগে যুগে অনেকই তো লেখা হল, আরো অনেক হবে। তবু তৃপ্তি নেই; সৃজন রহস্যের সব কিছু জানা হয়েছে, বেশ সাজান-গোছান ছক তৈরী করা গেছে এমন কথা বলবার মত মূঢ় দুঃসাহস নেই। নেই যে তাই বা বলি কী করে ?

সাহিত্য সমালোচনার সূত্র সাহিত্যের বাইরে, না ভেতরে, এ নিয়ে তর্কের লড়াই কম হয়নি; সে লড়াইএ রাজনৈতিক এবং ভাবনৈতিক বিরোধের রং-ও কম চড়ানো হয়নি। প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়া নামে দুটি মোটা দাগ টেনে সাহিত্যিক মূল্য যাচাইএর চেষ্টা চলছে এখনও; সাহিত্য স্রষ্টার রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক শ্রেণীসংস্থান ইত্যাদিকে সমালোচনার সূত্র হিসেবে নেওয়া হয়েছে। অনেক সময়ে গৌণ হয়েছে রসের আস্বাদন এবং উপলব্ধি। প্রাধান্য পেয়েছে সাহিত্যের বিষয় অথবা তত্ত্বের সামাজিক মূল্য-বিচার। এ অবশ্য নতুন নয়, প্লেটোর আমল থেকেই সাহিত্যকে বিশেষ কোনো একটি দর্শন, ধর্ম কিংবা নীতির মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা চলে আসছে। প্রগতিবাদের নামে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনাও অনেকটা এই তত্ত্বাশ্রয়ী ধারাকে অনুসরণ করেছে। তাতে সাহিত্য বিচারে অনেক নতুন, অর্থপূর্ণ উপাদান সংগৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু সমালোচনার সূত্র নানা মতবাদের চোরাগলিতে পথ হারিয়েছে। অবস্থা হতবুদ্ধিকর হয়েছে বিশেষ করে কতকগুলি প্রগতিবাদী দেশের সাহিত্য বিচারপদ্ধতির হাকিমী কায়দার ফলে।

সাহিত্য বিচারে হাকিমী কায়দা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। ধর্ম অথবা সুনীতির শাস্ত্রবচনের দোহাই দিয়ে চোখ রাঙানি আগের অনেক যুগেও ছিল, এখনও আছে। বিলেতে জেফ্রীস্ এবং জন্‌সন আর এদেশের সাহিত্যিক সমাজপতিদের জবরদস্ত মতামতের কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। তবে এইসব বনেদী সাহিত্য শাসকদের পেছনে রাষ্ট্রশক্তির কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের জোর ছিল না। এঁরা যা বলতেন নিজেদের জোরেই বলতেন এবং এঁদের অভিমত যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, কোনো সাহিত্যিকের উদ্যমকে এঁরা দম বন্ধ করে মারতে পারেননি, সেরকম কোন উদ্দেশ্যও এঁরা পোষণ করতেন না। 'কোয়ার্টার্লি'র সমালোচকের আক্রমণে

কীট্‌স মারা যাননি, লেখাও বন্ধ করেননি। চরম বিদ্বেষপূর্ণ বিরূপ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের অথবা কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিক স্বকীয়তাকে, উদ্যমকে বিনষ্ট করতে পারেনি। প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মোটা দাগ-কাটা সাহিত্য বিচারপদ্ধতির নতুন যে ছক আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছে, রসোপলব্ধি ব্যাহত করছে, মূল্য বিচারে বিপর্যয় আনছে তার জুড়ি নেই আগের কোনো যুগে।

কথাটা এবার আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার। সামাজিক তত্ত্বই কি সাহিত্য বিচারের প্রথম এবং শেষ কথা? জানি, একথার জবাবে ক্রুশ্চেভ, মাও সে তুং, নেহেরু এবং বিধানচন্দ্র রায় সকলেই একবাক্যে বলবেন, না, না, শিল্পকৌশল সাহিত্যে থাকাই চাই। কিন্তু এ হল যাকে বলা যায়, 'কন্‌সেশন', কিছুটা ঢিল দেওয়া, তবে অনিচ্ছার সঙ্গে ঢিল দেওয়া অর্থাৎ 'গ্রাজিং কন্‌সেশন' (grudging concession)। সোভিয়েট দেশে গত চল্লিশ বছরে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং উপকরণ নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার মোদ্দা কথা হল বিষয়বস্তুর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্ব মানতেই হবে। মাঝে মাঝে যখন এই গুরুত্ব মানতে গিয়ে সাহিত্যের জীবনীশক্তি একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন দেওয়া হয়েছে 'কন্‌সেশন'। আমরা যারা সোভিয়েট সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আগ্রহের সঙ্গে, ধৈর্য এবং সহানুভূতির সঙ্গে অনেক আশা নিয়ে, মনোযোগ নিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি, সাহিত্য বিচার ও সমালোচনার নতুন সূত্র আবিষ্কার করতে পারা যাবে ভেবেছি তারা শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই চুপ করে গেছি। কী যে হচ্ছে তার তাৎপর্য বার করতে পারা যেন আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। একমাত্র যা সাধ্যের মধ্যে সে হল ক্রুশ্চেভের অথবা মাও সে তুং-এর সর্বশেষতম সাহিত্যিক নির্দেশ প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া অথবা না মেনে নেওয়া। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সাহিত্যিক

আদর্শ এবং উদ্যমের এই কঠিন বন্ধন কখনও কখনও অনিবার্য হতে পারে, তার সাময়িক ফল ভালো বা মন্দ হতে পারে। সে বিচার পরে হবে। এরকম কঠিন বন্ধন আমাদের সাহিত্যিক রুচি এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলান কঠিন, অসম্ভবপ্রায়—সম্ভব কেবল অনুশাসনে অন্ধ বিশ্বাসী হতে পারলে। তা পারা সম্ভব নয়; মার্ক্স-এঙ্গেল্সও সহজে পারতেন মনে হয় না। এই হল আপাতত আমাদের হতবুদ্ধিকর চিন্তাসংকটের কারণ।

সাহিত্য সমালোচনার যে প্রগতিবাদী সূত্র ত্রিশ দশক থেকে আমরা সন্ধান করছি তার প্রথম রচনাকার হিসেবে মার্ক্স-এঙ্গেল্সকে স্মরণ না করে উপায় নেই। সাহিত্যের সামাজিক উৎস এবং ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে মার্ক্স-এঙ্গেল্সের অভিমত সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা কখনও সাহিত্যিককে অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির বশংবদ ভৃত্য মনে করেননি। সাহিত্য-সৃজন প্রতিভাকে রাজনীতি-অর্থনীতির উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্ররূপে তাঁরা দেখেননি। জর্মান সাহিত্যের একটি বিপুল ঐশ্বর্যময় যুগের অবসানকাল মার্ক্স-এঙ্গেল্সের মানসিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনায় রসবোধের অভাব ছিল না। গ্যয়টের অসাধারণ সৃজন-শক্তি ও স্বকীয়তাকে তাঁরা অনায়াসে গ্রহণ করেছিলেন শিল্পগত উৎকর্ষ বিচার করে। প্রচারধর্মী লেখার প্রতি তাঁদের অবজ্ঞাও ছিল সুস্পষ্ট। রাজনীতির বিচারে কবি হাইনের উপর মার্ক্স-এঙ্গেল্স প্রসন্ন ছিলেন না, তবু তাঁর সাহিত্য-কৃতির মূল্য তাঁরা অস্বীকার করেননি। শেক্সপীয়র মার্ক্সের কণ্ঠস্থ ছিল; মার্ক্সের লেখায়ও দেখা যায় শেক্সপীয়র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি। তা বলে শেক্সপীয়রকে অথবা গ্যয়টেকে কোনো আঁটসাঁট সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ছকে ফেলবার চেষ্টা করেননি। এক কথায় বলতে গেলে, সাহিত্য-শিল্পকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করতেই হবে, এমন কোনো ইঙ্গিত মার্ক্স-এঙ্গেল্সের লেখায় পাওয়া যায় না।

তবে মানুষের অথবা সমাজের জীবনে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসতে পারে যখন একটিমাত্র চিন্তা, একটিমাত্র সংকল্প সবকিছু ভাবনা ধারণা উদ্যম এবং উদ্‌যোগকে কেন্দ্রীভূত করে। সে হল সংকটের বা আপৎকালের দাবি। ধরা যেতে পারে সে রকম সময়ে সাহিত্যের ধর্মও সে-ই একমাত্র লক্ষ্যে সমর্পিত হয়। তবে এরকম অবস্থা স্বাভাবিক নয়; সমস্ত মানবিক অনুভূতিকে একটিমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত করলে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ-বৈচিত্র্যের পথ রুদ্ধ করা হয়। সাহিত্যকে রাজনীতির অথবা বিপ্লবের হাতিয়ার করতে হবে এরকম দাবি কোন কোন সময়ে এবং অবস্থায় কিছুটা সঙ্গত হতে পারে। কিন্তু এই দাবিকে সাহিত্যধর্মের পরম ও চরম সত্য বলে মেনে নেওয়া মানে সাহিত্যের অপঘাত মৃত্যু। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স এমন কিছু যে চাননি তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এমন কি লেনিনও রাষ্ট্রবিপ্লবে অনন্যচিত্ত হয়েও ভুলতে পারেননি যে, সাহিত্য সৃজনের মানবিক সত্য রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স দেখেছিলেন ধনতান্ত্রিক শোষণ ও শ্রেণী আধিপত্যের ফলে মানুষের জীবন খণ্ডিত হচ্ছে, টুকরো টুকরো যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। তাঁরা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই কল্পনা করেছিলেন। রেনেসাঁর পূর্ণাঙ্গ মানুষ, ও তার নানা বিষয়ে কৌতূহল, কল্পনা এবং প্রয়াসের স্বচ্ছন্দ বিহার—লেনার্ডো ডাভিঞ্চির মত মানুষের জীবন-সাধনা ছিল মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের আদর্শ। বেটোফেনের সোনাটা শুনে লেনিন একদিন বলেছিলেন, "রোজ এই সঙ্গীত শুনতে পারলে আমি খুশী হতাম। অপূর্ব অতিমানবীয় সঙ্গীত্ এ; সব সময়ে গর্বের সঙ্গে আমি ভাবি মানুষ কত পরমাশ্চর্য কাজই না করতে পারে।" সাহিত্য শিল্পে এই পরমাশ্চর্য কল্পনাশক্তির অবাধ বিকাশকে 'বুর্জোয়া বিকার' মনে করেননি, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স লেনিন। তবে অবস্থা-ক্রমে লেনিন বোধ-হয় নিছক সাহিত্যিক আবেগকে চিত্তবিক্ষেপকারী দুর্বলতা মনে

করে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সে হল আপৎকালের নিরুপায় সমাধান, সংকটের দাবি পূরণ। যার জন্য লেনিন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিপন্ন সুরে বলেছিলেন, "এসব সঙ্গীত বেশী শুনলে মনকে অভিভূত করে, নির্বোধের মত অনেক মিষ্টি কথা বলতে ইচ্ছে করে, যারা এই জঘন্য নরকে বাস করেও এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তাদের আদর করতে ইচ্ছে করে।"

প্লেটোর দর্শনেও কবি, সৌন্দর্যস্রষ্টার প্রতি বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদীর এই রকম ভয় ; কবিরা মন ভোলায়, উন্মাদনা সৃষ্টি করে, বিশুদ্ধ তত্ত্ব-চিন্তায় একাগ্রতা নষ্ট করে। ব্রহ্মবাদী প্লেটো এবং মার্ক্সীয় বস্তুবাদী লেনিনের মনোভঙ্গির মধ্যে এখানে বিশেষ তফাত নেই দেখা যায়। দু-পক্ষই সৌন্দর্যের বিস্ময়কর ক্ষমতায় মুগ্ধ, এবং সেজন্যই সাহিত্য শিল্পের মনোহারিণী প্রভাবকে এড়িয়ে যাবার, সংযত করবার পক্ষপাতী। লেনিনের সময় থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্য এবং শিল্পকলাকে একটা সুনির্দিষ্ট প্রলেটেরিয়ান ছকে ফেলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। তবে লেনিন নিজে একে খুব উৎসাহ দেননি। পুস্কিন বুর্জোয়া কবি অতএব অপাঠ্য, এবং তার চেয়ে মায়াকভ্স্কি অনেক ভালো, এ রকম উদ্ভট সাহিত্যিক মূল্য বিচারে লেনিন সায় দেননি। তবু ধীরে ধীরে সোভিয়েট ইউনিয়নে সাহিত্যিক মূল্য-বিচারের পদ্ধতিকে দলগত এবং শ্রেণীগত রাজনীতির নির্দেশে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হল। কেন এরকম হল তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

আমাদের দেশে যেমন পরাধীনতার যুগে, তেমনি রাশিয়ায় জারের আমলে সাহিত্যিক আবেগ কল্পনা ও সৃজনের একটা বৃহৎ ও মহৎ অংশের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল। সাহিত্যই ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের প্রধান বাহন। তার অজস্র অপূর্ব নিদর্শন উনিশ শতকের বিপুল সৃজনশীল রাশিয়ান সাহিত্যে,

পুস্কিনের, টুর্গনেভের, টলস্টয়ের, গর্কির এবং আরো অনেকের লেখায়। কাজেই রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনও একেবারে অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তফাত এই যে, বিপ্লবের আগে জনজীবনের উপাদান নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি যাঁরা করেছিলেন তাঁরা তা করেছিলেন স্বেচ্ছায়, জীবনের নিবিড় অনুভব থেকে প্রেরণা নিয়ে। এই সাহিত্য সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে সমাজনির্ভর, জনমনের রূপকার। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স সাহিত্যকে এই স্বাভাবিক অর্থেই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত দেখেছিলেন। 'ডিক্টেটারশিপ অব্ দি প্রলেটেরিয়েট' অর্থাৎ সর্বহারার একনায়কত্বে সাহিত্যকে সর্বগ্রাসী একনায়কত্বের কাছে সর্ব সমর্পণ করতে হবে, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স এতদূর পর্যন্ত বোধ-হয় কল্পনা করেননি। সোভিয়েট বিপ্লবের পর রাশিয়ায় এরকম ঘটল তার কারণ মনে হয় প্রধানত দুটি। এক হল, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, জারের আমলেও সৃজনশীল সাহিত্য রাজনীতিকে সহজ ভাবে আত্মস্থ করেছিল। বিপ্লবের পর নতুন সমাজ গঠনে সাহিত্যের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তাই একনিষ্ঠ বলশেভিক-দের মনে কোন দ্বিধা ঘটেনি। সহজেই মার্ক্সবাদী সূত্রকে সরাসরি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত হল সাহিত্য তথা আর্ট একেবারে পুরোপুরি রাজনৈতিক হাতিয়ার। এর ফলে অতীতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির সমালোচনায় দেখা দিল নানা রকম উগ্র বিকার যার অনেকখানি হাস্যকর, অর্থহীন। এরই মধ্যে দু-চারটি আলোচনায় কালেভদ্রে নতুন বিচারপদ্ধতির কিছু ভাববার মতো ইঙ্গিত পাওয়া গেল; সাহিত্যের পটভূমির সামাজিক তত্ত্ব এবং তথ্য আবিষ্কার করে সমালোচনার নতুন মূল্যবান একটি সূত্র সন্ধান করতে পারল। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অবশ্য নতুন নয়; প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক টে'নও এই ধরনের সমালোচনার একটি ধারা প্রবর্তন করেন। সে ধারাটির আংশিক মূল্য

এখনও মানতে হয়। তবে যেমন টে'নের সূত্র তেমনি মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বাস্তববাদী সূত্র, দুই-ই সাহিত্যের বিচিত্র রূপ ও প্রকরণের সব নয়, কয়েকটি মাত্র দিকের উপর আলোকপাত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কোন্ সমাজে, কি অবস্থায় বর্ধিত, বিকশিত হয়েছে তা আবিষ্কার করলেই সব কিছু জানা বা বলা হয় না। সমালোচনার সূত্র তাই এক এবং অদ্বিতীয় নয়। এঙ্গেল্‌সও তার ইঙ্গিত করেছিলেন। সামাজিক প্রতিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব সমালোচনার ভিত্তিভূমি হলেও সাহিত্যের স্বরাজ্য, প্রতিভার স্বকীয়তা এবং শিল্পকর্মের নিজস্ব বহুমুখী রীতিনীতি, এসবই সমালোচনার সূত্র রচনা ও প্রয়োগে একটা প্রধান অংশ দাবি করতে পারে।

গোড়ায় যে প্রশ্নের উল্লেখ করেছি—সাহিত্যের রসোপলব্ধি এবং মূল্যবিচারের ক্ষেত্র কি সাহিত্যের বাইরে না ভেতরে? এক কথায় এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয়, বাইরে এবং ভেতরে উভয়ত, তবে দুটোই পরস্পর নির্ভর, একটি অন্যটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। টি. এস. এলিয়ট এক জায়গায় বলেছেন, সাহিত্য সমালোচনার দুই প্রান্তে দু-রকম ভ্রান্তির ঝোঁক রয়েছে। একটি ঝোঁক হল লেবরেটরীতে বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে সাহিত্যের সব কিছুকে খণ্ড খণ্ড করে সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি অথবা ধর্মের মালমসলা আবিষ্কার করা। আর একটি, যাকে বলা যায় লেবু নিংড়ে সবখানি রস বার করার চেষ্টা অর্থাৎ কোনো লেখার ভাবানুবাদ করে, রকমারি ব্যাখ্যা এবং ভাষ্যে ভারাক্রান্ত করে সাহিত্যকে জীবনসম্পর্কচ্যুত তত্ত্বসর্বস্ব অথবা ভঙ্গিসর্বস্ব করা। প্রথম ঝোঁকটি হল সাহিত্যকে ষোল-আনা বাইরে থেকে বিচার করবার, যার বিষম পরিণতি দেখা যায় সর্বগ্রাসী সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনায়। দ্বিতীয় ঝোঁকটি হল সাহিত্যকে ষোল-আনা ভেতর থেকে দেখা, যার পরিচয় মেলে শৌখীন অন্তঃসারহীন কলাসর্বস্ব ভাববিলাসে।

লেবুর রস-নিংড়ানো সাহিত্যবিচারে অবশ্য মাস্টারী উৎসাহও কম যায় না।

একথা প্রত্যেক রসপিপাসু মানলে ভালো হয় যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং আবেদন কেবল বাইরে থেকে সমাজতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ করে বোঝা যায় না। আবার কেবল ভেতর থেকে মামুলী ব্যাখ্যার পদ্ধতি দিয়েও নয়। কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতিই কতকগুলি উপাদানের শুদ্ধমাত্র যোগফল নয়। তার রূপ এবং মর্মগত রহস্য এমন জটিল যে উপাদানগুলো ভেঙে ভেঙে বার করলেই সমালোচনার উদ্দেশ্য সফল হয় না। কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে ভালো ভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কিম্বা শেলীর 'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড'কে ভেঙে ভেঙে ব্যাখ্যা করলে কিংবা সারার্থের সমাজতাত্ত্বিক মূল্য বিচার করলে ওই অপূর্ব কবিতা দুটির সৌন্দর্য এবং শক্তির বিন্দুমাত্র স্পর্শ পাওয়া যায় না।

এখন আবার সাহিত্যকে রাজনীতি কিংবা বিচিত্র কোনো মতবাদের হাতিয়ার গণ্য করার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। আগেই বলা হয়েছে, জারের আমল থেকেই রাশিয়ায় সাহিত্যের একটা প্রবল রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। বিপ্লবের পর সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী প্রবলভাবে অনুভূত হল। সাহিত্যের যে মনোহর ক্ষমতা প্লেটো এবং লেনিন উভয়েই অনুভব করেছিলেন তাকে নতুন সমাজগঠনে প্রচারধর্মী কাজে লাগানোর তাগিদ না এসে পারে না। এর পর একদলীয় একনায়কত্বের অধীনে সাহিত্যসৃষ্টির হুকুমত্ বেশ করে এঁটে বসল 'সমাজবাদী বাস্তবতা'র নামে। ত্রিশ দশকে 'সমাজবাদী বাস্তবতা'র ফরমায়েস বা ফরমান কী রকম ছিল তার ২।১টি সূত্র উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীতি নির্দেশে বলা হল, আদর্শ মার্ক্সবাদী সাহিত্যের কর্তব্য হবে—প্রলেটেরীয় পাঠককে শ্রেণীসংগ্রামে তার ভূমিকাটি বুঝতে সাহায্য

করা। অতএব আদর্শ মার্ক্সবাদী সাহিত্য (১) প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা প্রকারান্তরে শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব ফলাফল দেখিয়ে দেবে; (২) লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হবে সর্বহারা শ্রেণীর পুরোধার উপযুক্ত। এরকম নির্দেশের একাগ্র আদর্শনিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। তবে মুশ্‌কিল এই যে, এমন কঠিন ছাঁচে ঢালা সাহিত্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র জটিল ও বিপুল প্রবাহকে ধরা যায় না। সাহিত্যের দাবি এবং আবেগ সমগ্র জীবনের সমান্তরাল। সাহিত্যিকের সৃজন-কর্ম জীবনের সঙ্গে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে সংযুক্ত হোক কেবল বাস্তব প্রয়োজনে নয়; মানবিক কল্পনার অবাধ সঞ্চরণের তাগিদও একটা বড়ো প্রয়োজন, এ অস্বীকার করলে সাহিত্য প্রাণহীন বিকলাঙ্গ না হয়ে পারে না। ফর্মুলার এবং ফরমায়েসের সাহিত্যকর্ম আজকের একদিনের ছোটবড়ো প্রয়োজনের দাবি হয়তো পূরণ করতে পারে। কিন্তু তার স্থায়ী মূল্য সামান্যই। তার একটি প্রমাণ ফর্মুলা এবং সরকারী ফরমায়েসের সাহিত্যের চাইতে 'ক্লাসিক' অর্থাৎ চিরায়ত সাহিত্য এবং বিদেশী লেখকদের লেখার জনপ্রিয়তা বেশী সোভিয়েট পাঠক মহলে। পেশাদার লেখা, প্রচারধর্মী লেখা, এর দরকার আছে, এরও ভালো-মন্দ বিচার আছে। কিন্তু এর দরকার এবং বিচার দিয়ে সমালোচনার সেই সূত্র পাওয়া যাবে না, যা দ্বারা সামগ্রিক জীবনের পটভূমিতে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব।

প্রয়োজনের সাহিত্য এবং অপ্রয়োজনের সাহিত্য—এ ভাবে কখনো কখনো সাহিত্যকে ভাগ করা হয়। তার চেয়ে স্বীকার করা ভালো মানুষের জীবনে প্রয়োজনের বিচিত্র সমারোহে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়; প্রয়োজনের গুণ এবং পরিমাণের মাত্রা-ভেদ থাকতে পারে; সময় এবং অবস্থা-বিশেষে কোন প্রয়োজন-বিশেষ প্রাধান্য পেতে পারে। অনেক আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ কল্পনার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন জমাখরচের হিসাবে হয়তো কোনো দিনই ধরা

যায় না। মানুষ যন্ত্রও নয়, আবার দেহহীন আইডিয়া মাত্রও নয়। তাই মানবিক সত্তার স্থূল এবং সূক্ষ্ম সব প্রয়োজন মিলিয়েই জীবন-প্রবাহ। এই প্রবাহ থেকে যে কোনো একটিমাত্র ধারাকে পৃথক করে নিয়ে বাঁধ দিলে মানবধর্মকে বিকৃত করা হয়। এককালে শাস্ত্র ও ধর্মের অনুশাসন এরকম কঠিন বাঁধনে বাঁধতে চেষ্টা করেছিল মানুষের ভাবনা ধারণা, কল্পনা ও আচরণকে। তার প্রতিবাদেই পূর্ণাঙ্গ মানববাদের স্বপক্ষে লোকায়ত চিন্তা ও কর্মধারা গড়ে উঠেছিল দেশে দেশে রেনেসাঁ ও রেফরমেশনের যুগ থেকে। কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদ সেই সুদূরপ্রসারী বলিষ্ঠ-মানববাদের ঐতিহ্যবাহী বলেই জেনেছিলাম। শ্রেণী সমাজের অন্তর্নিহিত বিরোধ দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মানবধর্মের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজ হবে, স্বচ্ছন্দ হবে, মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স এই কথাই বার বার নানা ভাবে বলেছেন। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তির কঠিন বন্ধন ও অনুশাসন মানুষের সহস্র-ধার সৃজনী আবেগকে একটিমাত্র কাটা খালে ঠেলে দেবে, এ যেমন অসহনীয় তেমনি অস্বাভাবিক।

সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ, স্ফুট কিম্বা অস্ফুট প্রভাব সব যুগেই থাকে এবং থাকবে। তা স্বাভাবিক এবং অপ্রতিরোধ্য। 'ডিসিপ্লিন' বা অনুশাসন কিন্তু তা নয়। রসসৃষ্টি এবং রসতৃপ্তির সঙ্গে বাইরে ফর্মুলা-বানানো 'ডিসিপ্লিন' স্বাভাবিক ভাবে খাপ খায় না। 'ডিসিপ্লিন' আইনের মত এককাট্টা, ব্যতিক্রম মানে সেখানে ব্যভিচার। 'ডিসিপ্লিনের' কড়া ব্যবস্থায় চমৎকারিত্বের কোন স্বাভাবিক স্বীকৃতি নেই। রসসৃষ্টি ও রসতৃপ্তির অন্য পাঁচটা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্য রেখে চলবে এমন কোনো কথা নেই। ফ্রান্সিস টম্‌সন লণ্ডন ব্রিজের তলায় শীতে অনাহারে জীবন্মৃত অবস্থায় যে কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়নি।

তবু কে বলতে পারবে যে ক্ষুধার নিবৃত্তিটাই সব সময়ে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন ? কোন আদর্শনিষ্ঠ মার্ক্সবাদীই এমন কথা বলতে পারে না ; মালয়ের যে স্কুলমাস্টার ফাঁসির মঞ্চে উঠে "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" ধ্বনি দিয়েছিল সে তার নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবেনি। সাহিত্য সৃজনের স্বচ্ছন্দ আবেগকেও তেমনি কোনো কঠোর একদেশদর্শী অনুশাসনের অধীনে ভাবা চলে না। একথা ঠিক যে, জীবনবিমুখতা, ভঙ্গিসর্বস্ব শৌখীন কলাকৌশল সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতাকে নষ্ট করে। কিন্তু আবার অক্ষরে অক্ষরে সমাজ-সচেতন হয়েও সাহিত্য তার প্রাণশক্তি হারিয়ে নিতান্ত সাময়িক বক্তব্যের বাহন হয়ে পড়তে পারে।

কথা হল এই যে, সাহিত্য সামাজিক, রাষ্ট্রিক নয়। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হলেও তার সামগ্রিক মানবিক সত্তা সব শ্রেণীর মানুষই অল্পবিস্তর অনুভব করে। 'শেষের কবিতা'র কল্পনাময় রসোচ্ছল ভাবানুষঙ্গ অথবা 'হ্যামলেটের' চিন্তাদ্বন্দ্ব শ্রেণীগত গণ্ডি ছাড়িয়ে মনকে অভিভূত করতে পারে, দল বা দর্শন বা রাষ্ট্রীয় নেতা তা ঠেকাতে পারে না। এর একটি কারণ কতকগুলি মৌলিক মানবীয় অনুভূতি সর্বজনীন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও সেগুলি একেবারে আলাদা আলাদা শ্রেণীর গণ্ডিতে বাঁধা নয়। তেমনি ভাষাও সামাজিক। তাকে কঠিন ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না, যেমন যায় না প্রকৃতিকে, নিসর্গ সৌন্দর্যকে। সাহিত্য যেহেতু সমাজনির্ভর এবং অনেক বিকৃতি ও শ্রেণীসংকীর্ণতা সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক মানবীয় অনুভূতি থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, তাই সাহিত্যকে শেষ পর্যন্ত সমাজ-সত্তার সঙ্গে সর্বজনীন সম্বন্ধ রাখতেই হয়। রাষ্ট্র লুপ্ত হলে, পরিবর্তিত হলেও ব্যক্তি বা সমাজ লুপ্ত হয় না। তেমনি শ্রেণী বা দল বা মত লুপ্ত কিম্বা পরিবর্তিত হলেও সাহিত্য লুপ্ত হয় না। রাষ্ট্রবিচারে যে নায়ক, সাহিত্যবিচারে সে নায়ক না হওয়াই সম্ভব। রাষ্ট্রের কাছে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গান হচ্ছে

"জনগণমন"। ব্যক্তির কাছে, সে ব্যক্তি যে কোনো শ্রেণীরই হোক না কেন, বিশেষ একটি ক্ষণে সবচেয়ে মধুর, গভীর, অর্থপূর্ণ হৃদয়ের ভাষা হল,

"ভালবাসি,
এই কথাটি জলে স্থলে কাছে দূরে
বাজায় বাঁশী।"

(১৯৫৮)

———

গল্পের গতি

'টাইম্‌স লিটারেরী সাপ্লিমেণ্টের' একটি বিশেষ সংখ্যায় পৃথিবীর নানা দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যিক প্রয়াসের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, বিশ্লেষণ ও মূল্যবিচার টাইম্‌সের বনেদী ভারিক্কী চালের, তবে কিছু কিছু মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সাহিত্যধারা সম্পর্কে আলোচনাটিতে সাম্প্রতিক সুপরিচিত লেখক এবং লেখার উল্লেখ খুব সামান্যই করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের মন কোন্‌দিকে ঝুঁকেছে, কি তার সমস্যা, সংকট এবং সংকল্প তারই মোটামুটি বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা থেকে উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, এতদিন যে পাখী খাঁচায় ছিল, সে খোলা আকাশে উড়তে ভয় পাচ্ছে। যতদিন খাঁচা ছিল বন্ধ, কল্পনার পাখা ঝাপটানিতে লেখকরা ততদিন অনেক বেশী সৃজনশীল, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন। স্বাধীনতার পরে লেখকরা নতুন জীবনের মধ্যে এখনও কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না, বিরাট কোনো সম্ভাবনার আশ্বাস দেখছেন না। অনেক লেখক চলেছেন পুরোনো বাঁধা রাস্তায়। দেশ-বিভাগের যে মর্মান্তিক নাটক চোখের উপরে তাঁরা দেখেছেন তা নিয়েও গভীর আবেগের সঙ্গে বড়ো কিছু তাঁরা লিখতে পারেন নি। অনেক লেখকের ঝোঁক সমালোচনা, ব্যঙ্গ এবং তিক্ততার দিকে। গল্প অনেক লেখা হয়েছে কালোবাজার, অনাচার, আমলাতন্ত্র, মুদ্রাস্ফীতির বিষম বিভ্রাট নিয়ে। যন্ত্রণা এবং তিক্ততা ছাড়া সৃজনধর্মী গুণ এইসব লেখায় সামান্যই আছে। অনেক লেখায় উদ্যমের অভাব এবং অপরিণত

প্রয়াসের চিহ্নও দেখা যায়। সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকেরা প্রকাশকের ফরমায়েস অনুযায়ী লিখে থাকেন, সহজ অর্থাগমের জন্য। নানা রাজনৈতিক মতবাদের আলোড়নে ভারতবর্ষের মানস-লোক বিক্ষুব্ধ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কমিউনিটি প্রোজেক্ট অথবা আচার্য বিনোবা ভাবের আধ্যাত্মিক বিপ্লব নিয়ে গান, গল্প লেখা হলেও শ্রেষ্ঠ লেখকদের উপরে এইসব বিষয়ের প্রভাব খুব সামান্য এবং অস্পষ্ট। অনেক লেখক প্রেরণা নিচ্ছেন চীন, রাশিয়া, জাপান এবং মিসরের সাহিত্য থেকে। যদিও নিরাশার সুরই আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রবল, কিছু কিছু তরুণ লেখক তবু আশা করছেন যে জীবন ও সাহিত্যসৃজনের মধ্যে নতুন সমন্বয় ঘটবে।

বিদেশী সমালোচকের বর্ণনা ও মন্তব্য খুব অতিরঞ্জিত নয়; এই ধরনের কথা গত কয়েক বৎসর ধরে এখানেও নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। ইতিমধ্যে, আশ্চর্যের কথাই বলতে হবে, সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প সম্বন্ধে আমরা প্রায় একবাক্যে মেনে নিয়েছি, আর যাই হোক না কেন ছোটগল্পে আমাদের সাহিত্য-কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হয়তো কথাটা ঠিক। কিন্তু সবটা ঠিক নয়। প্রাচুর্য এবং শিল্পচাতুর্য সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের গণ্ডি খুব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ছোটগল্প প্রচুর লেখা হচ্ছে, সন্দেহ নেই, তবে এখনো তার চাহিদা প্রধানত সাময়িক পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খুব কম লেখক সরাসরি ছোটগল্পের বই প্রকাশ করতে সাহস পান, যদিচ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস সাময়িক পত্রের মাধ্যমে পরিচিতির অপেক্ষা না করেও প্রকাশিত হয়। যা হোক এ হয়তো আধুনিক পাঠক এবং প্রকাশক-গোষ্ঠীর প্রচলিত অভ্যাস নিয়ে কথা। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে রসজ্ঞদের রায় হল, বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগ বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করছে—বিষয়বস্তু, অঙ্গসজ্জা, প্রকাশবৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম

শিল্পচাতুর্যে কেবল বাংলার নয় ভারতের গর্বের বস্তু হয়েছে, পৃথিবীর দরবারে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে এমন গল্প বাংলা ভাষায় কম নেই। এই অভিমত যদি যথার্থ হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে স্বাধীনতার পরে বাংলা সাহিত্যের অন্তত একটি ধারা আশ্চর্যভাবে বেগবান, সমৃদ্ধ ও সার্থক হয়েছে, যখন কিনা অন্য অনেক দেশের সাহিত্য-প্রয়াস স্তিমিত, বিবর্ণ বলে আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে। বিষয়বস্তু, প্রকাশবৈচিত্র্য ও শিল্পচাতুর্য ছোটগল্পের এই চতুর্বর্গ গুণ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে, একথা ভাবতে ভালই লাগে। তবু সন্দেহ থেকে যায় সত্যিই কি সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর পরিধি বহুবিস্তৃত হয়েছে? কয়েকটি মাত্র ভালো গল্পের নজীর দিয়ে মনকে তুষ্ট করলে চলবে না। বিষয়বস্তুর হঠাৎ চমক লাগানো গুণ, হালকা ঢং, মিষ্টি লেখা, আমাদের অনেক পাঠকেরই মন ভোলায়, অনেক সমালোচকেরও। তবু সবিনয়ে এবং সসংকোচে বলতে হচ্ছে, বিষয়বস্তু এবং প্রকাশবৈচিত্র্যের দিক থেকে সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের গণ্ডি এখনও সীমাবদ্ধ, এবং ভয় হয় আরও সংকীর্ণ হচ্ছে।

এই মন্তব্যের সঙ্গে কোনো মতবাদের সম্পর্ক নেই; বিদেশী নজীর দিয়ে সমর্থন করার গরজ নেই এবং যদি নজীর দিতে হয় তবে ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কথাই স্মরণ করতে হবে। বিদেশী কথা-শিল্পীদের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনা করে কোনো একজন মননশীল তরুণ সমালোচক লিখেছেন, "বাংলা ছোটগল্পের অনেক গুণ আছে, কিন্তু ম'মের চাতুরী নেই। গল্প হচ্ছে মোপাসাঁর গল্প, ম'মের গল্প। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্প। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প। মাত্র একটা দুটো গল্প নিয়ে দম্ভ কিছু কাজের কথা নয়।" আমাদের ছোটগল্পের শিল্পগত উৎকর্ষ নিয়ে খুব বেশী বড়াই করা হচ্ছে, এরকম ইঙ্গিত করা অনুচিত হবে। দু'একটি মাত্র সাম্প্রতিক বাংলা গল্প শ্রেষ্ঠস্থানীয় একথাও ঠিক নয়। ম'মের রচনা-কৌশল

চমৎকার হলেও মনোভঙ্গী খুব উদার নয়। বাংলাতেও নবীন এবং প্রবীণ কোনো কোনো লেখকের কিছু কিছু গল্প বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা-বৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে। তবে অনেক লেখকই—যাঁরা খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁদের গল্পে বিষয়বস্তু এবং প্রকাশবৈচিত্র্যে কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা আনতে পারেন নি। সাময়িক পত্রে যেসব তরুণ লেখক সাম্প্রতিক কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকের গল্পেই এক ধরনের হালকা রোমান্টিকতা দেখা দিয়েছে। "কানু বিনা গীত নাই," প্রেম ছাড়া গল্প নেই, হয়তো একথা সত্যিই। কিন্তু বিরহ-মিলন কথার যে নতুন ঢং দেখা দিয়েছে তার অনেকখানি অসুস্থ, অস্বাভাবিক কল্পনার মাদকতা দিয়ে তৈরী মনে হয়। ফ্রয়েড্ অনেকদিন বিদায় নিয়েছেন—এখন আর গল্পের নায়ক-নায়িকারা অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে লুকোচুরি খেলেন না। এখন 'রিপ্রেশন' নয় 'ইম্যান্সিপেশন' ; ফ্রয়েডের স্থান নিয়েছেন ক্র্যাফট-এবিং, স্টেকেল এবং হয়তো অল্পবিস্তর কীন্সে রিপোর্ট। দেহতত্ত্ব নিয়ে বৈষ্ণবীয় অথবা প্লেটনিক স্বেদ কমল পুলকও সেকেলে হয়ে গিয়েছে ; উপরন্তু কোনো কোনো মহল থেকে শোনা যাচ্ছে, "বাঙ্গালী লেখকের ভাষা এবং ভাবনা এখনো সত্যের টানে লজ্জা ঘৃণা ভয় জয় করতে শেখেনি।" যদি শিখতে হয় তবে ফিরে যাও, আদিরসের ফোয়ারা ফরাসী রাবেলের (Rabelais) পাঁতাগ্রুয়েলী হুল্লোড়ে। অতদূর অবশ্য আমাদের জনপ্রিয় তরুণ গল্প-লেখকেরা এখনো অগ্রসর হতে পারেন নি। তবে "দেহের আদিম প্রক্রিয়া প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অদ্ভুত কুণ্ঠা" তাঁদের কাটছে। সাহিত্যে শ্লীলতাবোধ সম্পর্কে নীতিবাগীশের দোহাই আমি দিচ্ছি না, কোনো মতবাদেরও নয়।

সাহিত্য যখন জীবন-জিজ্ঞাসা এবং জীবনের সমালোচনা-ও তখন প্রশ্ন ওঠে, ছোটগল্পের এই নতুন স্বভাববাদী রোমান্টিক কিম্বা

অতি-বাস্তব ঝোঁকের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কতখানি? নতুন কিছু সম্পর্ক ঘটেছে অবশ্য। স্বাধীনতার পরে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ অভিজাত শ্রেণীর পর্যায়ে অথবা তার কাছাকাছি উঠেছেন। তাঁদের কাছে গান্ধীবাদী আধ্যাত্মিকতার দাম এখন কানাকড়িও নয়—রাজনৈতিক জুয়াখেলায় মাত্র এর প্রয়োজন। গভীর ভাবনা, নতুন মূল্যবোধও এঁদের কাছে অস্বস্তিকর। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সেকেলে—তাঁর গল্পে উপন্যাসে কবিতায় নতুন আলোকপ্রাপ্ত নাইট ক্লাব বিহারী এই সচ্ছল স্বাধিকারপ্রমত্ত শ্রেণীর মনের কথা, জীবনের কথা কৈ? তাই এক উপায় হল, অমিট্রায়ে এবং লাবণ্যকে দেহ সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন করে ক্লাবে, রেস্তরাঁয় ট্রেনে, হোটেলে এনে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা, দেহতত্ত্বের রকমারি বিকার ও বিরাগকে লরেন্সীয় ঢঙে পুনরাবৃত্তি করা। নীতিবাগীশ হিসেবে আপত্তি করার প্রশ্ন উঠ্ছে না। সঁ্যাত্ ব্যভ্ (Sainte Beuve) নাকি নিপোলিয়নকে একবার বলেছিলেন, অন্য সব ক্ষেত্রে যাই হোক সাহিত্যে ধাপ্পাবাজি অচল। হয়তো অচল, তবে সে একেবারে শেষ হিসাবনিকাশে অর্থাৎ কালোত্তীর্ণ হতে পারার পরীক্ষায়। কিন্তু আমাদের কাল কি সুদ্ধমাত্র লরেন্স, ম'ম, নর্মান মে'লার, ফ্রাঁসোয়া সার্গের অনুকরণের, রোমন্থনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? তরুণতম গল্পকার গোষ্ঠীর লেখা দেখে সেইরকম যেন আশঙ্কা হচ্ছে।

কথা হল যে, সাহিত্যের এই শৌখীন মজ্দুরির সঙ্গে বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিরাট চরিত্রগত প্রভেদ। আমাদের এই ধরনের রোমান্টিক অথবা স্বভাববাদী কাহিনীতে নরনারীর রূপ একরঙ্গা, দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ নেই। বাঙ্গালীর হাড় মোটা নয়, তার জীবনযাত্রা ভদ্র দস্তুর পোষমানা, এই সংকীর্ণ জীবনের গণ্ডিতে দেহতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিলাস রোগের লক্ষণ বলে গণ্য হওয়া উচিত। বিষয়-বস্তুর বিচারে আমাদের ছোটগল্পের এই জনপ্রিয় উপাদান মন

ভোলাতে পারে, কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেহরহস্য আবিষ্কারের 'আনন্দ' দিতে পারে, নতুন আলোকপ্রাপ্ত সচ্ছল উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'ইম্যান্‌সিপেশন্‌' ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু শিল্পগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না—অন্তত যে শ্রেষ্ঠত্ব জীবনের সমালোচনা হিসেবে প্রাপ্য, তা পেতে পারে না। এবং শিল্পচাতুর্যে এই ধরনের গল্প হয়তো কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছে—তা-ও বেশী নয়—পাঠকের মনকে সহজে কৌতূহলে, উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত করার জন্য এই ধরনের অনেক গল্পেরই বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষা চটুল, অথবা পরমপুরুষীয় ভাবরসে বিভোল; চরিত্র এবং কাহিনী দৃঢ়-সম্বদ্ধ নয়। প্রকাশবৈচিত্র্যের দিক দিয়ে নিছক প্রেমের গল্পের ফর্মুলা কয়েকটি বাঁধাধরা। কোনো কোনো রসজ্ঞের মতে এটা প্রায় সবদেশেই। বাংলা গল্পে বাঁধাধরা ফর্মুলার প্রয়োগ আরো গণ্ডি-বদ্ধ হবেই—কারণ এখানে জীবনের দুকূল ছাপানো জোয়ার সমস্ত মানবিক আবেগের সঙ্গে মিশিয়ে প্রেমকে বলিষ্ঠ রূপ দিতে পারে কদাচিৎ, প্রেমের বাঁধাধরা ফর্মুলা কয়েকটির উল্লেখ করে কোনো রসজ্ঞ সমালোচক বলেছেন—

প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে নায়ক অথবা নায়িকা বিবাহিত এবং পরে পরস্পর আকৃষ্ট হয়েছে অথবা পূর্বরাগ পরে নতুন করে দেখা দিয়েছে। এই ফর্মুলার অবশ্য অনেক রকম অদলবদল চলে—বাংলা ছোটগল্পে তার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। এরপর হল নায়ক-নায়িকার চরিত্রের টাইপ, নায়ক (১) প্রণয় ব্যাপারে সুকৌশলী অথবা (২) গোবেচারী পোষা কুকুরের মত। (৩) নায়িকা বিবাহিতা, কিন্তু স্বামী হয় ব্যস্ত, নয় কুৎসিত এবং অক্ষম নয়ত রসজ্ঞানহীন। সাম্প্রতিক বাংলা গল্পে এই 'চিরন্তন ত্রিভুজের' প্রকাশ-বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। ঘটনা সংস্থান খুব বেশী বদলায়নি, গল্পের মূলগত প্রকৃতি ও পরিণতিতে স্বাভাবিক জীবনের নিয়মবন্ধন থেকে 'ইম্যান্‌সিপেশনের' জোয়ার এসেছে মাত্র।

কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসা তীব্র হয়েছে, অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, একথা বলা যায় কি? কোনো লেখক বা লেখার নাম উল্লেখ করা অনুচিত হবে। পাঠকদের কাছে কি ভাবে এইসব গল্পের পরিচয় দেওয়া হয় তার দু'চারটি উদাহরণ থেকে অনুমান করা যায় যে অধিকাংশ জনপ্রিয় ছোটগল্পের রোমান্টিকতা যেন চারু বন্দ্যো, মণীন্দ্রলাল বসুকে 'কুণ্ঠাবর্জিত' স্বভাববাদী ঢঙে ঢেলে সাজাচ্ছে মাত্র, এর সঙ্গে রূপালী পর্দার 'ক্লোজ-আপ' ভঙ্গীও আছে কিছু। "মিথ্যা আভিজাত্যের দুর্গে আবদ্ধ পাঁচটি অনূঢ়া কন্যার অভিশাপ আর অভিলাষের কাহিনী" আর "আজকের রক্তমাংসের জীবনের আর দিগ্‌ভ্রান্ত যৌবনের স্বপ্ন, প্রেম ভালবাসার অধঃপতন ও উজ্জীবনের অনন্যসাধারণ রূপায়ণ।" "একদিকে পূর্ব স্মৃতির রং···অন্যদিকে শিক্ষিতা উজ্জ্বল এক ধনী কন্যার আত্মসমর্পণের শপথ।" "গল্পগুলির অধিকাংশই স্বাদে এবং বিষয়ে কোমল ও মিষ্ট রসাশ্রিত।" গল্পের আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত 'দ্বারিক ঘোষ' অথবা 'ফ্লরী ও ট্রিংকা'র মিষ্টান্নের শরণ নিচ্ছে! চলতি এবং জনপ্রিয় অনেক গল্পের বিষয়বস্তুর পরিচয় এই রকম। এইসব গল্পেরও শিল্পচাতুর্য আছে বৈ কি ? 'স্নবারি'র চাতুর্য আছে, "প্রত্নতত্ত্ব এবং পানীয়তত্ত্ব থেকে টুকে" নতুন আলোকপ্রাপ্তদের 'সফিস্টিকেশন' আছে, হয়তো এর দরকারও ঘটেছে—নতুবা মার্ক্সবাদকে 'বিদেশী' বলে যাঁরা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা অনেকে এই মর্কট-বাদকে সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিতে উৎসাহী হয়েছেন কেন ?

এই-ই সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের সবখানি পরিচয় নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে অথবা শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে ভালো লেখা হচ্ছে বৈ কি—শিল্প-চাতুর্যের দিক থেকে, ঘটনা সংস্থাপনের পারিপাট্যে চমৎকার, কিন্তু বিষয়বস্তু এই ধরনের গল্পের সুপরিচিত গণ্ডি অতিক্রম করেনি,

প্রকাশবৈচিত্র্য হয়তো কিছু নতুন, কিছু বেশী প্রখর অনুভূতিপ্রবণ গল্পের মেজাজ, অবস্থার সঙ্গে চরিত্রের, আশার সঙ্গে পরিণামের নিষ্করুণ দ্বন্দ্ব আগের চেয়ে আরো তীব্র। কিন্তু এ ধরনের অনেকগুলি গল্প একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে বিষয়বস্তু, প্রকাশবৈচিত্র্য প্রায় এক রকমের, জীবন-জিজ্ঞাসার একটিমাত্র সূত্রের উপর বারে বারে দাগ কাটা—সেই সূত্র হল, "যাহা চাই তাহা পাই না"। আমরা এবং বেশীর ভাগ গল্প-লিখিয়েরাই ঘরের কোণের মানুষ, তা-ও আবার শহরের এবং বেশীর ভাগ কলকাতা শহরের। টেবিলের পাশে বসে কিছু স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে অনেকবার দেখা কাছাকাছির চেনা জগৎকে নিয়েই গল্পের ছক ফাঁদতে হয়। এর বাইরে যাঁরা অগ্রসর হন তাঁরাও অনেকে বোম্বাই শহরতলির ঝকঝকে ফ্ল্যাট, অথবা কোনো রেলের কলোনি কি হাসপাতালের অভিনব পরিবেশে প্রণয়কুশল নায়ক-নায়িকাকে উপস্থিত করে কিছু চমক সৃষ্টি করেন। তবে সে চমক বিষয়বস্তুর সামান্যই। আবার লরেন্সের 'লেডী চ্যাটার্লীর প্রেমিক' থেকে দেহ-কামনা ও অক্ষমতার জটিল সমস্যা কিছু কিছু বাংলা ছোট-গল্পে রঙ্গীন জল মিশিয়ে লোভনীয় করে চালানো হচ্ছে। এই ধরনের গল্প লিখতেও ঘরের কোণে খানকতক বই এবং কিছু লিপি-কুশলতা থাকলেই যথেষ্ট। যথেষ্ট, কিন্তু বাংলা গল্প সাহিত্যের শিল্পগত উৎকর্ষ বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সে দিক থেকে বরঞ্চ কোনো কোনো প্রবীণ লেখকের গল্প বাঁধা নিরাপদ লাইনের হলেও রসোত্তীর্ণ, মনে সুদৃঢ় ছাপ রেখে যায়। মতবাদ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। লেখক মাত্রেরই যখন মস্তিষ্ক আছে তখন মতও নিশ্চয়ই আছে। যাঁরা নিতান্ত মত প্রতিপাদন করার জন্য গল্প লিখেছেন তাঁরা প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছেন, যেখানে সফল হয়েছেন সেখানে মত নয়, গল্প দানা বেঁধেছে কোনো একটা বিশেষ মনোভঙ্গীকে ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে ভাব-গূঢ় রূপ

দিয়ে। গর্কির 'চেল্‌কাস্‌' কি কোনো মতের বাহন অথবা মোপাসাঁর 'নেক্‌লেস্‌'? দুটি গল্পই অবিস্মরণীয়, জীবনের সমালোচনায়, অনুরাগে, অসন্তোষে, সহানুভূতিতে সমুজ্জ্বল। এই প্রবন্ধে বাংলা ছোটগল্প-লেখক কারোই নাম উল্লেখ করব না। প্রবীণ এবং নবীন কোনো কোনো লেখক গল্পের বাঁধাধরা গণ্ডি ভাঙ্গতে পেরেছেন; 'স্নবারি' অথবা 'সফিস্টিকেশনে'র আশ্রয় নেন নি, জীবন-জিজ্ঞাসা মানেই দেহ-কামনার অকুণ্ঠ প্রকাশ এমন কোনো 'ডেকাডেণ্ট' ঢং অনুকরণ করেন নি এবং তাঁরা মতবাদের ক্ষেত্রে কেউ দক্ষিণপন্থী কেউ বা বামপন্থী হলেও বাংলা সাহিত্যে সুস্থ সৃজনধর্মী ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন।

সস্তা চমক এবং উত্তেজনা, চটুল বচন-বিলাস, 'স্নবারি' এবং 'সফিস্টিকেশনের' আতিশয্যের বিরুদ্ধে মন্তব্যের মধ্যে মতবাদের কোনো ইঙ্গিত নেই। যদিচ একথা বোধ হয় সত্য যে, মতবাদ সম্পর্কে নির্দোষ থাকার উদ্দেশ্যে অনেক গল্প-লেখক উপরোক্ত নিরাপদ শিল্পচাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছেন। আর যাই হোক না কেন, আলোকপ্রাপ্ত নতুন সমাজপতিদের কাছে 'ডেকাডেণ্ট' লক্ষণ, 'স্নবারি' এবং 'সফিস্টিকেশন' আপত্তিকর বা সন্দেহজনক মনে হবে না।

গল্পের গণ্ডিবদ্ধতা সম্বন্ধে অভিযোগ নতুন নয়, মতবাদ-প্ররোচিত ত নয়ই; তাছাড়া এই অভিযোগ সাম্প্রতিক কালে অন্য অনেক দেশের সাহিত্য সম্বন্ধেই শোনা যাচ্ছে। আসলে অভিযোগটা বর্তমানকালে সৃজনশীল সাহিত্যের ক্লান্তি এবং দৈন্য সম্বন্ধে। 'টাইম্‌স লিটারেরী সাপ্লিমেণ্টের' দেশ-বিদেশের সাহিত্য পরিক্রমায় মন্তব্য করা হয়েছে—আজকের দিনে কঠোর ভাবে বিচার করলে, বলতে হবে যে, প্রায় সব দেশেই লেখার কৌশল এবং ক্ষমতা লেখার উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। আগের চেয়ে ক্রমেই অনেক বেশী লেখক মোটামুটি শিল্পচাতুর্য আয়ত্ত করতে পেরেছেন, কিন্তু ক্রমেই

খুব কম লেখকের নতুন কিছু বলবার থাকছে ("fewer and fewer have anything fresh to say")।

'মতবাদের অত্যাচার' থেকে যাঁরা মুক্ত, তাঁরাই কিনা নিজেদের সাহিত্য-প্রয়াস সম্বন্ধে এই আক্ষেপ করেছেন। 'সংস্কৃতির স্বাধীনতাবাদী' স্টিফেন স্পেণ্ডার বলছেন, যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ডে কোনো বিশিষ্ট প্রতিভাবান তরুণ লেখক দেখা দেয় নি। বেশীর ভাগ তরুণ লেখকই মামুলী ধরন এবং নিরাপদ পথ বেছে নিয়েছে (formality and safety)। মার্কিন মুলুকেও একই আক্ষেপোক্তি। ত্রিশ দশকের সেই দুঃসাহসিক সৃজনপ্রয়াস নেই। ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী-মহলের সোজা সড়ক 'অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-লণ্ডন-অ্যাক্সিস'। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাকি বুদ্ধিজীবী মানে হল যার বগলদাবায় ব্রিফকেস, যার সৌভাগ্য-কল্পনার সীমানা হল স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অথবা 'টাইম' 'লাইফ' 'ফরচুনের' পেশাদারী প্রতিষ্ঠা।

গল্পের গণ্ডি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ত্রিশ দশকে সিরিল কনোলী ইংরেজী কথাসাহিত্যের সংকীর্ণতা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন তা' থেকে এখনকার রোগ-লক্ষণও নির্ণয় করা যায়। কনোলী বলেছিলেন, "ইংরেজের জীবনে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অ্যাডভেঞ্চার বা বৈচিত্র্য বিশেষ নেই। শতকরা নব্বুই জন ইংরেজ লেখক বনেদী বুদ্ধিজীবী পরিবারের; এই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের অভিজ্ঞতা বড়জোর তিন-চার পর্বে সম্পূর্ণ—শান্তিপূর্ণ শৈশব, পাবলিক স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, তারপর কিছুদিন লণ্ডনে বা মফস্বলে বাস, চাকরি, স্ত্রী, বাড়ি এবং কয়েকটি সন্তান প্রাপ্তি। এর থেকে বড়জোর একখানা বইএর উপাদান মিলতে পারে—কিন্তু এরপরে খুব আঁট-সাঁট শ্রেণী-বিভাগের ফলে আর পা বাড়ানোর উপায় নেই।" কনোলীর মতে এই কারণেই ইংরেজী কথা-সাহিত্যের বিষয়বস্তু এত স্বল্প। কনোলীর কথা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে এবং মনে হবে ইংলণ্ডেই যদি গল্প-লেখকদের

ভাবদৈন্য এই রকম হয়, তাহলে অভিজ্ঞতার বিস্তারে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে আমাদের গল্প-লিখিয়েরা কোথায় দাঁড়াবেন? কনোলীর কথা একেবারে অগ্রাহ্য করার মত নয়। কনোলীর মন্তব্য কুড়ি বৎসর পূর্বের। কিন্তু প্রায় একই রকম অভিযোগ এখনও স্টিফেন স্পেণ্ডারের মুখে। 'ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী' শিরোনামায় একটা মূল্যবান প্রবন্ধে এডয়োর্ড শীল্‌স্‌ এই বিষয়ের উপরে সম্প্রতি আরো সুস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন। শীল্‌স্‌ বলছেন, উঁচু দরের সংস্কৃতি যাঁদের করায়ত্ত—অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-লণ্ডন মার্কা বুদ্ধিজীবী যাঁরা তাঁদের ঝোঁক হল সংস্কৃতিকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এর ফলাফল যা হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের বর্তমান লক্ষণ কিছু কিছু মেলে এবং সেইটিই 'গল্পের গণ্ডি' বলে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি। শীল্‌স্‌ বলছেন, প্রথম ফল হল ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর সহানুভূতিবোধ এবং কৌতূহল অত্যন্ত সংকীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ। গত পঞ্চাশ বৎসরের ইংরেজী সাহিত্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর বিষয়বস্তুর পরিধি কত সংকীর্ণ। মজুরশ্রেণীর জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস নিঃসন্দেহে দুর্লভ; যেসব লেখকেরা সাহিত্যের বনেদী বিচারে পাস হন, বি. বি. সি.'র প্রশংসা পান, তাঁরা ত মজুর জীবন নিয়ে লেখেনই না। সাম্প্রতিক কালের প্রধান প্রধান ইংরেজ লেখকদের রচনাবলী অনুসন্ধান করলে কি দেখা যায়? মজুর শ্রেণীর কথা এঁদের কোনো লেখাতে নামমাত্র নেই। দোকানদার, কেরানী, ছোট ব্যবসাদারদের জীবন অথবা চরিত্রই কি আছে এঁদের লেখাতে? শীল্‌স্‌ বলছেন, উচ্চতর সংস্কৃতির সৌভাগ্যমন্ত লেখকেরা এই স্তরের লোকদের প্রতি সামান্য নজর দিয়ে থাকেন—তবে সামান্যই।

জীবনবোধ এবং শিল্পদৃষ্টির এই যে সংকীর্ণ খণ্ডিত রূপ লেখকের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে, লেখকের মতবাদ-নিরপেক্ষতা দিয়ে সমর্থন করা যায় কি? শীল্‌স্‌ও সেই প্রশ্ন তুলেছেন—কোনো

মারাত্মক মতবাদের ভিত্তি থেকে নয় নিশ্চয়ই—কারণ শীল্‌সের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে স্পেণ্ডর সম্পাদিত 'এনকাউণ্টার' পত্রিকায়। মতবাদের অন্ধ আনুগত্য অথবা রাজনৈতিক নির্দেশের সঙ্গে সাহিত্যকে সমান তালে পা ফেলে কুচকাওয়াজ করানো নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। কিন্তু সাহিত্যের স্বরাজ্যকে বৃহৎ জীবনপ্রবাহ থেকে আলাদা করে রাখলে ক্ষতি যা হয় তা মতবাদের অন্ধ আনুগত্যের চাইতে কম নয়। শীল্‌স্ বলেছেন, স্পষ্টই দেখা যায় ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদের অনুরাগ কৌতূহল এবং প্রয়াস নিজেদের শ্রেণীগত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, সমাজের বৃহত্তর অংশ সম্বন্ধে তাঁরা অন্ধ অথবা উদাসীন। শীল্‌স্ আরও বলেছেন, এই মনোভঙ্গী অবশ্য রাজনীতির দিক থেকে সুবিধাজনক কিন্তু বুদ্ধিজীবীর পক্ষে ভালো নয়, কারণ বুদ্ধিজীবীর একটি কাজ হল সমাজ ও সংস্কৃতির সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণ ও সমালোচনা।

দেখা যাচ্ছে সৃজনধর্মী শিল্পের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে জীবনের সুবিস্তৃত গভীর সংযোগ ও উপলব্ধি চাই-ই। 'মতবাদের অত্যাচার' সম্বন্ধে বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে অনেকে ভেবেছিলেন মত সম্বন্ধে উদাসীন অথবা নিরপেক্ষ হলেই সাহিত্য-সৃজনের পথ সোজা হয়ে গেল। জীবনের প্রতি, মানুষের সমাজের, নিজের দেশের বৃহৎ অংশের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ ও দায়িত্ববোধ যদি না থাকে তবে সাহিত্যিক সৃজন-প্রয়াসের কোনো মহৎ সম্ভাবনা দেখা যাবে না।

(১৯৫৫)

রুটির চেয়ে বড়ো

এই আপ্তবাক্য প্রথমতঃ ধর্মতত্ত্বের; তারপর দর্শনের দরজা দিয়ে এসেছে সাহিত্য ও রাজনীতিতে। রুটির চেয়ে বড়ো অনেক কিছুই, একথা মান্‌তে সোজা আপত্তি করার কারণ হয়তো নেই। কিন্তু এর ব্যবহারিক অর্থ এবং দার্শনিক অর্থের মধ্যে যে মস্ত ফাঁক আছে সেটা উপেক্ষা করা চলে না। রুটির চেয়ে বড়ো একথা বলার সার্থকতা থাকে যখন রুটির যোগান সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি নিশ্চিন্ত। এই পশ্চিম বাংলায় বারো লক্ষ বেকার, আরো কয়েক লক্ষ উদ্‌বাস্তু এবং কলকাতার ফুটপাথে গর-ঠিকানা বাসিন্দার সংখ্যা তিন-চার লাখ; এখানে "রুটির চেয়ে বড়ো" কথাটার মহাজনোচিত মহত্ত্ব অনুভব করা সহজ হতে পারে না।

রাজনীতি এসে পড়ছে হয়তো। ঠিক এই সময়টায় আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির আড়ি চল্‌ছে। কেবল আমাদের বলি কেন? য়ুরোপের বনেদী এলাকায় সাহিত্যের নজর উঁচু হয়েছে, মেজাজ বদলেছে। "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধনে" গরজ আর যারই থাক না কেন, সাহিত্যিকের নেই। এ হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের সাহিত্য-মানসের বড়ো একটি অংশের কথা। এমন নয় যে, সাহিত্যিকরা জীবন-বিবাগী হয়েছেন, রুটি ও রুজির সমস্যামুক্ত হতে পেরেছেন। আমাদের ঘরের কাছের সাহিত্যিকরা তো নয়ই। তাহলে রুটির চেয়ে বড়ো কথাটার মধ্যে জীবনের, কল্পনার মুক্তির কী আশ্বাসে সাহিত্যে নতুন রং ধরছে? বোধহয় এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই, অথবা যেটা আছে তার মূল বক্তব্য নঙর্থক। রুটির চেয়ে বড়ো অর্থাৎ ভালো এবং উপাদেয় হল 'কেক'—মারি আঁতোয়ানেতের এই বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি

করতে আমরা কেউই সাহসী নই। রুটি এবং রুজি জীবনের দীর্ঘ গন্ধময় দ্বন্দ্বসংকুল নাটকের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে, এ না মেনে উপায় নেই। তা হোক্, কিন্তু রুটি ও রুজি হল মুখ্যতঃ রাজনীতির ব্যাপার; আর আমাদের সাহিত্যিকরা রাজনীতিতে বিশ্বাস হারিয়েছেন নানা কারণেই।

রাজনীতি মানে এখানে অবশ্য দলীয় রাজনীতি নয়, বিশেষ কোনো কর্মসূচী নয়। আঠার শতক থেকে যে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল সে রাজনীতির মূল কথা হল মানবপ্রগতি, যার একটি সূত্র প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধন। রুটি ও রুজির কথা নানা ভাবেই মানবপ্রগতির আদর্শ এবং আকাঙ্ক্ষার সাহিত্যিক স্বীকৃতি বয়ে এনেছে। তবে এখন স্রোত উল্টো দিকে বইতে শুরু করেছে। মানবপ্রগতি তথা ইউটোপিয়ার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও বিশ্বাসে চিড় ধরেছে। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির আড়ি মানে শুধু দলীয় রাজনীতি বর্জন নয়, মানব-প্রগতি সম্বন্ধেই সাহিত্যিক বিরাগ দেখা দিয়েছে। শেলী, বায়রন, রবীন্দ্রনাথের 'এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়াল' ভাষ্য আধুনিক সাহিত্য-মানসের সঙ্গে মিল রেখে কী হতে পারে জানি না। তবে শেলী, বায়রন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহৎ ও বৃহৎ সাহিত্যিকরা প্রচুরতম হিতসাধনের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি; তাঁদের কবিকৃতির বৃহত্তম অংশ আধুনিক বিচারে রাজনীতি-গন্ধী, মানবপ্রগতির জন্য অনুরাগে, ব্যাকুলতায় পবিত্র ক্রোধ ও বেদনায় মুখর।

রুটির চেয়ে বড়ো বৈকি এই সাহিত্যসৃষ্টি কর্মশালার বিপুল আয়োজন। বড়ো বলেই মানব-প্রত্যয়ের কোনো কিছুই এঁরা উপেক্ষা করেন নি, জীবনধারণ এবং জীবনের পূর্ণতর বিকাশের সমস্যা ও সংকল্প তাঁদের শিল্পী-মানসে বিকৃত এবং আত্মস্থ হতে পেরেছিল। আধুনিক সাহিত্যিকরা অনেকে রাজনীতির প্রতি বিরাগে, ভয়ে, সংকোচে, সংশয়ে অথবা ঘৃণায় রুটির চেয়ে বড়ো

কিছুর সন্ধানী বলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চাইছেন। ইউটোপিয়ায় বিশ্বাস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে নষ্টস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার জায়গায় যে অশ্রদ্ধা, আত্মপরতা, শৌখীন কথকতা সাহিত্যের সদর রাস্তায় আসর জমাচ্ছে তাকে রুচির চেয়ে, ইউটোপিয়ার অসম্ভব কল্পনা-বিলাসের চেয়ে ভালো বলতে দ্বিধা হয়। যে সাহিত্যিক ফ্রয়েডীয় 'লিবিডো'-কে কোনো নীতির দোহাই দিয়ে বর্জন করেন না তিনিই আবার "রুচির চেয়ে বড়ো"র দোহাই দিয়ে অতি সাবধানী শুচিতার সঙ্গে রাজনীতিকে কেন পরিহার করেন তা বোঝা যায় না। গ্রহণ-বর্জনের লেবেল আঁটার মধ্যে আর যাই থাক স্বাভাবিকতা নেই। কারণ এরকম বয়কট আন্দোলনও এক ধরনের রাজনীতিই।

হয়তো উপায় নেই। সাহিত্যের এই সাবধানী শঙ্কাকুল নিরাশ্বাস রূপ সভ্যতার-সংকটের খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। আপাততঃ ধরে নিতে হচ্ছে, শেলী রবীন্দ্রনাথের জীবনোপলব্ধি সত্য নয়, অথবা কালের ধারায় সে উপলব্ধির সার্থকতা নষ্ট হতে বসেছে। আপাততঃ 'এগ্‌জিস্‌টান্‌স'ই সত্য; কোনো কথা নয়, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধনের কোনো কল্পনা নয়, প্রতিশ্রুতি নয়, সুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকা আর জীবনকে উল্‌টে পাল্‌টে দেখা, বাইরে থেকে নির্লিপ্তভাবে, 'আউটসাইডার'-এর চোখ দিয়ে। অনেক দিন আগে, বোধহয় ত্রিশ দশকে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতায় ('তামাশা') এই মনোভাবটি চমৎকার ফুটে উঠেছিল :

"আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এ-পিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত বুদ্বুদ,
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,

আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকুতি।
জানি, এপিঠে নেইকো কোনো মানে।
তবু কি হবে তলিয়ে দেখে
এই তামাশা।”

এ বিদ্রূপ কেবল কোনো কাল্পনিক বিধাতা-পুরুষের তামাশার প্রতি নয়। সমস্ত মানবিক প্রত্যয় এবং প্রয়াসই যেন অর্থহীনতায় ভরপুর, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর অর্থহীনতা সত্ত্বেও জীবনকে ভালো না বেসে উপায় নেই।

বাঁচবার তাগিদটা তামাশা নয়, সে তাগিদকে মুছে ফেলা যায় না। তাই রুটির চেয়ে যা বড়ো তাকেও রুটি এবং রুজির জীবনকে আশ্রয় করে ঊর্ধ্ব পথে যাত্রা করতে হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাই এই স্থূল এবং সূক্ষ্মের দ্বন্দ্বমিলন, শুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকার জৈবিক তাগিদ আর সে তাগিদকে মহত্ত্বের মানবিক প্রেরণায়, স্বপ্নে ও সংকল্পে রূপান্তরিত করার নিরন্তর প্রয়াস। তাই আনাতোল ফ্রাঁস চমৎকার একটি বর্ণনায় দেখিয়েছেন, আমরা কী ভাবে একাধারে ডন্ কিক্‌সোট এবং সাঙ্কো পাঞ্জা।

ডন্ কিক্‌সোট বলছেন, “মহৎ বিষয়ের কথা চিন্তা করো। প্রকৃতিকে তুলে ধরো তোমার নিজের মাপে আর সমস্ত বিশ্ব জগৎ হোক তোমার অপরাজেয় আত্মার সমান ছাড়া আর কিছু নয়। সম্মানের জন্য সংগ্রাম করো ; একমাত্র তাই-ই মনুষ্যত্বের উপযুক্ত ; আর যদি তোমার ভাগ্যে জোটে নির্যাতন, আঘাত, তবে হাসিমুখে পবিত্র শিশিরবিন্দুর মতো তোমার রক্ত ঝরুক।”

আর সাঙ্কো সাবধানী বুদ্ধিমন্তের মতো বলছে,

“যেমনটি আছো তেমনটি থাকো, বন্ধু। শুকনো রুটির টুকরো যা পাও তাই খেয়ে খুশী থাকো। প্রভুকে মান্য করো, তিনি বিচক্ষণ বা নির্বোধ যা-ই হোন না কেন। বেশী জিনিস নিয়ে মাথা

ঘামিও না। মারের ভয়টা মনে রেখো। বিপদের ঝুঁকি কখনো নিও না।"

কথিকার উপসংহারে আনাতোল ফ্রাঁস বলছেন, "আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে ডন কিক্‌সোট ও সাঙ্কো পাঞ্জা—কখনো আমরা ডন কিক্‌সোটের কথা শুনে চলি আর কখনো সাঙ্কোর। সাঙ্কোর কথাই আমরা বেশী শুনি, তবে ডন কিক্‌সোটকে আমরা শ্রদ্ধা না করে পারি না।"

হয়তো আমাদের এ যুগটায় সাঙ্কো পাঞ্জার হিসেবিয়ানার প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী—প্রথমতঃ জীবনে এবং জীবন থেকে সাহিত্যেও। রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের যে বিচ্ছেদ ঘটছে সেটা একটা লক্ষণ মাত্র। আসল বিচ্ছেদ ঘটছে জীবনের সঙ্গে মানব-প্রত্যয়ের। দলীয় অর্থে নয়, ব্যাপক অর্থে রাজনীতি এই মানব-প্রত্যয়ের একটি ধারা মাত্র। এই ধারা এককালে বিশ্ব-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল, জীবন-চেতনায় উজ্জ্বল করেছিল মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টিকে। "রুচির চেয়ে বড়ো" এই আলগা কথা ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের সংকীর্ণতা এবং একদেশদর্শিতার নিন্দা হয়তো করা যায়। কিন্তু রুচির চেয়ে বড়ো কিছুর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ এর দ্বারা সত্যিই প্রকাশিত হয় না।

রুচির চেয়ে বড়ো হল জীবন-যন্ত্রণা, সমগ্র মানবজীবনের সঙ্গে প্রবল গভীর বেদনাময় একাত্মতা যার অসংখ্য নিদর্শন দিয়ে রচিত হয়েছে মহৎ সাহিত্যের ঐতিহ্য। ক্রীস্টোফারের সেই কাহিনী সাহিত্যেরও মর্মবাণী—ছোট্ট একটি শিশুকে কাঁধে নিয়ে চলেছে দৈত্য ক্রীস্টোফার; ছোট্ট সেই শিশুর ভারেই দৈত্য কাতর। শিশু তখন আশ্বাস দিল দৈত্যকে "আশ্চর্য হোয়ো না, আমাকে কাঁধে নিয়ে তুমি সারা পৃথিবীর ভার বয়ে চলেছ।" রুচির চেয়ে বড়ো বৈকি সমগ্র জীবন-জিজ্ঞাসার ভার। সে ভার সাহিত্যের, জীবন-সৃজন-শিল্পীর। সে ভার হাল্কা আল্‌গা কথার রঙীন টুকরো

সাজিয়ে, সাঙ্কো পাঞ্জার মতো সাবধানী চাতুর্যের চটুল কৌশল খাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় জীবনে, এবং সাহিত্যেও রুটির চেয়ে বড়ো কিছু ভাবতে উৎসাহী নন কিংবা সাহসী নন বলে এ-যুগের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী অনেকে সহজ সাফল্যের পথ ধরেছেন—যে পথের নির্দেশ হল "সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও" অর্থাৎ মেনে নাও, রুটির চেয়ে বড়ো হল রুটি দেবার ও কেড়ে নেবার কর্তারা—সেই কর্তাদের রাজনৈতিক রং এবং কলা-কৌশল লাল, সাদা যাই হোক না কেন।

ইউটোপিয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে যে মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে তার পরিণামে লেখক বুদ্ধিজীবী অনেকের লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে 'সাব্‌টোপিয়া'র আশু আরামপ্রদ আশ্রয়। রুটির চেয়ে বড়ো কিছু নয়, রুটির সঙ্গে মাখন আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভের জন্য এযুগের অনেক সাঙ্কো পাঞ্জার সাহিত্যিক দিগ্‌বিজয়।

(১৯৫৮)

চাবির সন্ধানে

উদাহরণটি উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এরিখ হেলার। এযুগের শিল্প-মানসের আলো-আঁধারির চমৎকার উদাহরণ এটি। কার্ল ভ্যালেন্টিন ছিলেন জার্মানীর একজন কৃতী অভিনয়-শিল্পী, দর্শনকে প্রহসনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলায় তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ", সামান্য এই কয়টি কথা যেমন বঙ্কিমের উপন্যাসের নবকুমার ও কপাল-কুণ্ডলার কাহিনীকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে আমাদের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে এক অদ্ভুত অস্পষ্ট সংশয়ে, কার্ল ভ্যালেন্টিনের কল্পিত একটি দৃশ্যও তেমনি মনকে অভিভূত করে; মনে হয় কি যেন আমরা হারিয়েছি আর সেই কী-যেনর সন্ধানে মর্মান্তিক হাস্যকর ভাবে বিড়ম্বিত হচ্ছি।

ভ্যালেন্টিনের এই দার্শনিক প্রহসনে যবনিকা যখন উঠলো তখন রঙ্গমঞ্চ অন্ধকারে ঢাকা। কেবল একটা কোণে রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের আলো ছোটো একটুখানি বৃত্ত রচনা করেছে। সেই আলোটুকুর বৃত্তের মাঝে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভ্যালেন্টিন ঘুরপাক খাচ্ছেন; কী যেন হারিয়েছে তাঁর, কী যেন খুঁজছেন তিনি। একজন পুলিসম্যান দেখা দিল, জিজ্ঞাসা করল তাঁকে, "কী হারিয়েছে?" "আমার বাড়িতে ঢোকবার চাবি।" পুলিসম্যানও হারানো চাবির সন্ধানে যোগ দিল। সেই অল্প একটুখানি আলোর গণ্ডির মধ্যে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পুলিসম্যান জিজ্ঞাসা করল, "চাবিটা এইখানেই হারিয়েছে ঠিক ত?" "না," ভ্যালেন্টিন জবাব

দিলেন, আর যেদিকটায় অন্ধকার সে দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "হারিয়েছে ওইখানে।"

"তাহলে এখানে খুঁজে মরছেন কেন?" "ওখানে যে আলো নেই," জবাব দিলেন ভ্যালেন্টিন। আমাদের অবস্থাটা প্রায় এই রকমই—এরিখ হেলার যাকে বর্ণনা করেছেন গৃহচ্যুত মানস (Disinherited mind), দিশাহীন, আশাহীন, জীবনের মূল্য এবং মহত্ত্ববোধ ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ।

ছোটো একটুখানি আলোর বৃত্ত, সাহিত্যের, শিল্পের এবং সংস্কৃতির। তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি আমরা হারানো চাবির সন্ধানে; আর চারপাশে নিবিড়, নিশ্চিদ্র অন্ধকার, যেখানে হারানো চাবির সন্ধান মিলতে পারে হয়ত, কিন্তু আলো নেই, জোর নেই সেই অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করবার। হয়ত এই সমস্যা সব যুগের, সব দেশের। সাময়িক দৃষ্টিতে সবযুগই সমস্যা ও সংকটের চেতনায় চঞ্চল। ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরিয়ার যুগ একদিক দিয়ে বিরাট সাফল্য ও সমৃদ্ধির সম্ভারে ঠাসা; টেনিসন-ব্রাউনিংএর উজ্জ্বল আলোক-বৃত্তকে কেন্দ্র করে দেখলে মনে হবে পরিতৃপ্তির শেষ নেই, বিশ্বাস এবং বৃহৎ উদ্যমের পীঠস্থানের গাঁথুনি এমন পাকা যে কোথাও সামান্য চিড় ধরবারও আশঙ্কা নেই। অথচ দেখি, ঐ যুগেই আবার ডিকেন্স, কার্লাইল, রাস্কিন এবং আরো অনেকে প্রবল অসন্তোষ এবং প্রতিবাদকে ভাবরূপ দিয়েছেন নানা ভাবে। সাহিত্যের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ঠিক একটির পরে একটি নিয়মবাঁধা পর্ব নয়। যৌবন ও জরা, আবেগ ও সমাহিতি, সম্ভাবনা ও পরিণতি সব যুগের সাহিত্য-প্রয়াসেই যেন একসঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে। তবে কখনো একটির ঝোঁক প্রবল, কখনও বা অন্যটির।

বাংলা সাহিত্যের ছোটো একটুখানি আলোক-বৃত্তের মধ্যে লেখকেরা কোন্ চাবির সন্ধান করছেন, তাঁদের ঝোঁকটা কোন্দিকে,

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সমসাময়িক বিচারে ত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশী। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং তারপর জীবিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র তারাশঙ্কর সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁরা জীবনদর্শনের রহস্য সন্ধানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, রঙ্গমঞ্চের যে সামান্য অংশটুকু আলোময় তাঁদের দৃষ্টি এবং সৃষ্টি তার চেয়ে অনেক দূর প্রসারিত হয়েছে। উত্তরসাধকদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মন সংশয়াপন্ন হয়, আধুনিকতার লক্ষণ মিলিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করা যায় না।

এই সংশয় এবং দ্বিধাও অবশ্য অতি পুরাতন কথা। প্রমথ চৌধুরী ৪৩ বৎসর পূর্বে তাঁর 'সবুজ পত্রে' লিখেছিলেন,

> "বঙ্গ সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব-সাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে।...বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে, স্বল্প-শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়।"

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাংলা সাহিত্যের যে 'গণধর্মের' সূত্রপাতের কথা বলেছেন সেটির যথার্থ পরিচয় হল অবশ্য লোক-রঞ্জক সাহিত্য বা 'পপুলার লিটারেচার'। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কালে বাংলা সাহিত্যে যে 'নতুন যুগের' সূত্রপাত হয়, 'গণধর্মী' আবির্ভাব হয় তার বিস্ময়কর বিবর্তন ও বিস্তার আমরা এখন আরো ভালো-মত দেখতে পাচ্ছি। 'স্বল্প-শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখক' এখন কেবল মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক নন। ' রঙ্গমঞ্চ এবং ছায়াচিত্রেও লোকরঞ্জনী—'গণধর্মী' সাহিত্যের কদর বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য যে প্রখরভাবে গণচেতন হয়েছে, একথা বলা যায় না; লেখকেরা গণসান্নিধ্যের জন্য উন্মুখ

হয়েছেন গণ-নিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন এরও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত বিশেষ দেখা যায় না। বরঞ্চ মনে হয় হাওয়া এখন উল্টোদিকে বইছে। প্রগতি ও গণধর্মের প্রতি নিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাঁরা সাহিত্যে নতুন সুর সংযোজনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের অনেকের উগ্রতা এবং একদেশদর্শিতা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

ব্যর্থতার কারণ অবশ্য এইটুকু নয়। বাঙ্গালী সমাজ-জীবনও নানাভাবে খণ্ডিত, বিপর্যস্ত হয়েছে যুদ্ধোত্তর এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বহুদিনের সংকল্প, সংগ্রাম এবং প্রতীক্ষার পর স্বাধীনতা যখন এল তখন আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন ছিন্নভিন্ন, বিকৃত হয়ে গেছে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত দেশ-বিভাগের ফলে। য়ুরোপও গত দশ বৎসরে দুঃখভোগ করেছে যথেষ্ট। কিন্তু য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনাই হয় না। য়ুরোপের সামাজিক কাঠামোর একটা বিশিষ্ট সুদৃঢ় রূপ গত একশ বৎসরে সুস্পষ্ট হয়েছে। য়ুরোপ বিপর্যস্ত হলেও তার সামাজিক শক্তির মূলধনে টান পড়েনি, তার মানস-সম্পদ এখনও বিচিত্র ঐশ্বর্যশালী। আমরা আঘাত পেয়েছি, পিছু হটতে বাধ্য হয়েছি ঠিক সেই সময়ে যখন কিনা আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন সংকল্প ও সম্ভাবনা দেখা দিল।

একযুগ আগেও বাঙ্গালী সমাজজীবনে যতটুকু সুস্থ, স্থিতিশীলতা ছিল তার সামান্যই আজ অবশিষ্ট আছে। এক সময়ে কল্পনা করে আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল যে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব হল মানবিকতার অনুশীলনে। বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির অন্তরঙ্গ সহযোগে আমাদের সাহিত্য প্রমাণ করতে চেয়েছিল, প্রকাশ করেছিল যে, "সবার উপরে মানুষ সত্য।" এখন কি বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির বিচ্ছেদ ঘটেছে ? বিরোধ দেখা দিয়েছে কি শিল্পীর আত্মবিকাশের সঙ্গে সুস্থ মানবিক সত্য-সন্ধানের ? পুরোপুরি নিরাশাবাদী উত্তর

দেওয়া উচিত হবে না। তবু আজকের এলোমেলো জীবন এবং আজকের সাহিত্যের তথাকথিত 'গণধর্মী' লোকরঞ্জনী ঝোঁক দেখে আশঙ্কা হয় মস্ত বড়ো ফাঁক দেখা দিয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রয়াসে। চোখ ঝলসানো সাফল্যের নিদর্শন হয়তো প্রচুর দেখা যাচ্ছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ করে বলা যায় "স্বল্প-শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন" এসেছে। নাগরিকতা-সুলভ বচন-পটুতা সাহিত্যের জৌলুস বাড়িয়েছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য" হয়ত এখনও, তবে সবার উপর সব মানুষই সত্য নয় সাহিত্যের বড়বাজারে।

ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরিয়ার যুগে সমাজজীবনের সাততলা ফ্ল্যাট বাড়ির একটির সঙ্গে আর একটির যোগসূত্র ছিল না, সবার উপরে সব মানুষ সত্য, একথা খুব কম সাহিত্য-শিল্পীই একান্তভাবে নিজস্ব করিতে পেরেছি'লেন। জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে কোন সাহিত্যই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; তবে বিকৃত হতে পারে জীবন-দর্শন; জীবনের বিড়ম্বনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চটকদার কাল্পনিক সমাধান সন্ধান করতে পারেন সমসাময়িক অনেক শিল্পীরা। এইরকম একটা ঝোঁক সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে প্রবল হয়েছে।

সবার উপরে মানুষ সত্য? সবার উপরে সব মানুষ সত্য? সুস্থ পরিচ্ছন্নতর সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে এক সময়ে এই প্রশ্নের দৃঢ় বিশ্বাসে স্পন্দিত, উদ্দীপ্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল। 'হিউম্যানিজম্' অথবা মানব-তন্ময়তা তার প্রেরণা পেয়েছিল জীবন থেকেই—যে জীবন সমস্যামুক্ত সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও উদার আদর্শের অনুসরণে যত্নবান ছিল। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিকারের যুগে অমানুষিকতার আঘাতে পীড়িত, ক্ষুব্ধ, নিরাশ্বাস জীবনে মানবতা-বোধ আজ প্রায় নিঃশেষিত। শিয়ালদ স্টেশনের বীভৎস অমানুষিকতার দৃশ্য দেখে কে আজ বলতে পারে

উদ্দীপ্ত বিশ্বাসের সঙ্গে, সবার উপরে মানুষ, সবার উপরে সব মানুষই সত্য।

অতএব সমগ্র জীবনের রূপোপলব্ধি করবার সাধনা আজ দুরূহ হয়েছে, শিল্পী-মানস সংকুচিত হয়েছে, সাহিত্য-প্রয়াসের ক্ষেত্র ছোটো করে নেওয়া হচ্ছে, সুখপাঠ্য কল্পনা ও রচনার চলতি ফ্যাশনের অজস্র নিদর্শন দেখাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য ওই সাতমহলা ফ্ল্যাট বাড়ির মতো একটি ছোট ছোট বৃত্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ; সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ আদান-প্রদান বিরল হচ্ছে। অবস্থা প্রায় সেই রকম ডিকেন্স যা বর্ণনা করেছিলেন ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে একশ বৎসর আগে—

"Dockyard people of upper rank don't know dockyard people of lower rank—dockyard people of lower rank don't know small gentry—small gentry don't know trades-people—commissioner don't know anybody."

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের লোকরঞ্জক প্রয়াসের অনেকখানিই এই "don't know"র লঘুক্রিয়া ; সেই রঙ্গমঞ্চের ঠাসা অন্ধকারের মধ্যে একটুখানি আলোক-বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া হারানো চাবির সন্ধানে।

(১৯৫৬)

'এ কেবল ফুটপাত্রে'

শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলে কখনও কবিতা লেখেনি, সভাসমিতি বা সাহিত্যচর্চা করেনি, একথা ভাবাই শক্ত। বর্ণাশ্রমপ্রথা বাংলা-দেশেই ভেঙেছে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। ওর-ই মধ্যে যে আশ্রম গত ত্রিশ বৎসরে আমরা 'লেখাপড়াজানা' বাঙ্গালী 'ভদ্রলোকেরা' গড়ে তুলেছি আশ্রয় হিসেবে, সে হল সাহিত্যাশ্রম। ওর আরো নতুন নতুন নাম ইদানীং চলতি হয়েছে। মোটের উপরে সাহিত্যিকতা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে; আর কিছু না হোক সেই অভ্যাসের বশেই সুযোগ পেলেই সাহিত্য নিয়ে দুচার কথা বলতে হয়। শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত তরুণকে নিয়ে কোনো কুল-চিহ্নিত (typical) কার্টুন সম্প্রতি আঁকা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অনেকদিন আগে গগন ঠাকুর এঁকেছিলেন একখানি—ন্যুব্জদেহ, কুব্জপৃষ্ঠ, মাথাটি দেহের অনুপাতে অসম্ভব বড়ো, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, আলুথালু চুল, ধুতি পাঞ্জাবি মাটিতে লোটানো, শরীরের চেয়ে ভারী বই-এর বোঝা হাতে। এখন অবশ্য এই কার্টুন অচল; যুদ্ধোত্তর এবং ৪৭-এর স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের 'প্রগতি'র ঐতিহাসিক গতিতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত তরুণের চেহারা, চালচলন ও পোশাকে পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর। ইংরেজের সাম্রাজ্য-গর্বী দাপট অনেক কমলেও তার বিখ্যাত কুল-চিহ্নিত কার্টুন-চরিত্র 'কর্ণেল ব্লিম্প' এখনও একেবারে বাতিল হয়নি। আধুনিক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত তরুণ সম্পর্কে গগন ঠাকুরের সেই অসহযোগ আমলের কার্টুন কিন্তু পুরোনো হয়ে গেছে। আমরা এবং আমাদের অনুজেরা সকলেই যে বদলেছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কথা হচ্ছে, সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্কটা কী? জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ যতখানি ততটাই সম্পর্ক। রাজনীতি ও মতবাদের কথা থাকুক, কারণ ও-দুটি নিয়ে কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত মত্ততা এত বেশী হয়েছে যে আমরা অনেকেই এখন প্রভাতকালীন শিরঃপীড়া এবং অনুতাপে ক্লিষ্টবোধ করছি। নিছক সাহিত্যিকতার দোষগুণ বিচার করতে রাজনীতি এবং মতবাদের শরণাপন্ন হওয়া দরকার হয় না। এখন যে সাহিত্যিকতার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে জীবনের জটিল সমস্যা ও সংকটের কোনো সামঞ্জস্য আছে কিনা তা অবশ্যই ভাব্‌বার বিষয়। সাহিত্যিকতা অভ্যাসমাত্র হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তার চেয়ে কিছু বেশী। আমাদের দেশে সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা স্বল্প, লেখকও খুব বেশী নয়, এসব অসুবিধা ত আছেই। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনার কথা হল আমাদের সাহিত্য-প্রয়াস এবং সাহিত্যচর্চা জীবনের অন্যান্য অংশ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে যাচ্ছে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ রাজনীতি সম্পর্কে উদাসী-জনতা, তা আদৌ আমার অভিযোগ নয়। কথা হচ্ছে যে, আমাদের সাহিত্যিকতার অভ্যাস জীবনকে অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করতে চেষ্টিত হয়েছে। আমাদের মধ্যবিত্ত মানসের গুটিকয়েক অভিজ্ঞতা, চরিত্র ও সমস্যা সম্বল করে সাহিত্যাশ্রম চলছে।

অনেকদিন আগের একটি সত্য ঘটনাকে নৈতিক উপাখ্যানরূপে এখানে ব্যবহার করতে ইচ্ছা হচ্ছে। অসহযোগ আন্দোলনের ঠিক পরবর্তী সময়ের কথা। মফস্বলের ছোটো একটি শহরের মধ্যবিত্ত তরুণেরা মিলে একটি 'তরুণ-সংঘ' প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রাথমিক উৎসাহের অভাব হল না। বেশ জমকালভাবে 'তরুণ-সংঘের' অনেকগুলি বিভাগ করা হল এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা সম্পাদক নির্বাচন করা হল। সাহিত্য বিভাগ, সেবা বিভাগ, পাঠাগার ও শরীরচর্চা বিভাগ ইত্যাদি তারুণ্যের সব

আদর্শ এবং দায়িত্বের দস্তুরমত সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়া হল। অতঃপর একদিন রাত্রে নির্বান্ধব এক ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর শবদাহ করা নিয়ে যে সমস্যাটি উঠল সেইটিই আমার এই উপাখ্যানের মূল কথা। শবদাহের জন্য লোক সংগ্রহ করা দরকার—হাতের কাছেই ছিলেন তরুণ-সংঘের সাহিত্য বিভাগের উৎসাহী এবং প্রকৃতই সাহিত্যরসিক সম্পাদক। সাহিত্য বিভাগের তরুণ সম্পাদককে অনুরোধ করা হল শব নিয়ে শ্মশানে যাওয়ার কাজে সাহায্য করবার জন্য; সাহিত্যরসিক তরুণ সবিস্ময়ে বললেন, "আমি? আমাকে যেতে হবে কেন? শবদাহ ত সেবা বিভাগের কাজ।" শেষ কথা বললেন, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যদি শোকসভা ডাকতে হয়, কবিতা লিখতে হয় কিংবা বক্তৃতা দিতে হয় তবে সে-কর্তব্য তাঁর পদাধিকার অনুযায়ী নিশ্চয়ই পালন করবেন।

মনে হয়, আমাদের সাহিত্যিকতাও সাম্প্রতিক কালে এইরকমভাবে জীবনকে, জীবনের বিচিত্র জটিলতাকে সুবিধামত আঁটসাঁট ভাগ করে নিয়েছে। সাহিত্যের মানবধর্ম, মানবিকতা, মানব-তন্ময়তা ইত্যাদি কথার কথা মাত্র নয়। যে মানবিকতার পরিচয় ভিক্তর হুগোর 'লে মিসেরাবল্‌সে', গল্‌স্‌ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগায়', রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃজনে তাকে শুদ্ধমাত্র সাহিত্যিকতার অভ্যাসে আয়ত্ত করা যায় না। ইদানীং আমরা যে সাহিত্যাশ্রম আশ্রয় করছি তাতে যেন বৃহত্তর জীবনসংস্পৃষ্ট ভাবনা-চিন্তার প্রবেশ ক্রমেই রুদ্ধ হচ্ছে। অথচ বাঙ্গালী সমাজ-মানসে উনিশ শতকের নবজীবন, বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের প্লাবনের পর এখনকার ভঙ্গীসর্বস্ব সাহিত্যিকতা আশ্চর্যভাবে ঐতিহ্যচ্যুত মনে হয়। ঘটনাচক্রে গত দশ-পনের বৎসরে বাঙ্গালী জীবনধারায় যে সর্বগ্রাসী মন্থন চলেছে তার ফলে অমৃতের চেয়ে বিষই উঠেছে বেশী। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ, ছিন্নমূল জীবনের জনস্রোত, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাকারবার, মুনাফাশিকার, সব কিছু

মিলিয়ে বাঙ্গালী সমাজের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছে অসংখ্য সমস্যা ও সংঘর্ষের উপাদান।

এক সময়ে আমরা প্রবলভাবে বিশ্বাস করেছি যে আমাদের যত কিছু দুর্গতির মূল হল বিদেশী শাসন; এই বিদেশী শাসনের অবসান ঘট্‌লেই আমাদের জীবন নতুন সৃষ্টির উদ্যমের জোয়ারে প্লাবিত হবে। এই বিশ্বাস প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের প্রত্যেকটি সৃষ্টিশীল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হয়নি বটে; তবে আমাদের চিত্তলোকের পশ্চাদ্‌ভূমি ঐ বিশ্বাসের আলোকে উজ্জ্বল ছিল, সন্দেহ নেই। সাহিত্যিক মাত্রেই রাজনীতির সঙ্গে নিজের ভাবনা-ধারণা, সৃজনপ্রয়াসকে সংযুক্ত করেন নি, কিন্তু সব সাহিত্যিকই অনুভব করেছেন বাঙ্গালী জীবনের গতিশীলতা, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য আদর্শ-প্রেরণার ব্যাকুলতা। 'ব্যক্তিত্ববাদী' এবং 'সমাজ-সচেতন'—এই ভেদ-চিহ্ন আমাদের সাহিত্যাশ্রমে দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক কালে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ববাদী আর কে হতে পারেন? আবার শিল্পীর মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে কে হয়েছেন তাঁর চেয়ে বেশী সচেতন? শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের উৎসাহী সমর্থক এবং সদস্য ছিলেন, অথচ তাঁর সাহিত্যপ্রয়াসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দলগত সত্য আশ্রয় করেনি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে ছিল জগৎ ও জীবনের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভীরুতা, উদাসীনতা, ক্লান্তি এবং মোহভঙ্গ ও আদর্শহীনতার বিকার দেখা দেয় যখন, তখনই সাহিত্যিক প্রয়াস ভঙ্গীসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। কুড়ি বৎসর আগে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,

"যখন অন্য কোনো কাজ থাকে না, তখন কি করে নাম করা যায়, টাকা পাওয়া যায় এই চিন্তা নিয়ে অনেকে সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু যাঁরা তা করেন না, যাঁরা সত্যিই সাহিত্যিক, তাঁদেরও আজ ভাব্‌বার প্রয়োজন হয়েছে—সাহিত্য কোন্

পথে যাওয়া উচিত। ফরমাশ দিয়ে সাহিত্যরচনা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার বলে নতুন ধারা দিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ধারা আজও চলছে। এখন ভাব্‌বার সময় হয়েছে কি করব। যাঁরা বলেন আর্ট ফর আর্ট্‌স সেক, আমি সে দলে নাই। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, যুবকেরা বেকার, মেয়েদেরও তুঃখতুর্দশার অন্ত নেই—এ অবস্থায় লেখার ধারা কোন্‌ পথে চল্‌বে—তা চিন্তা করার দিন এসেছে।"

কুড়ি বৎসর পরে আমরা এক অচিন্তনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছি ; সামাজিক তুর্গতি সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার ভার যেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের উপর, রাজনৈতিক দলগুলির উপর। সাহিত্যিক প্রতিভা ও প্রয়াসের পরিমণ্ডলের সঙ্গে জীবনের কোনো আদর্শগত সংযোগ থাকছে না। এদিকে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের ফলে নতুন সমাজ-বিন্যাসে শ্রেণীগত বিভেদ আগের চেয়েও স্পষ্ট ও প্রখর হয়েছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত তরুণ সম্প্রদায় কোনো নতুন আদর্শগত প্রেরণার ভিত্তিতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা অনুশীলনে অগ্রণী হতে পারছেন না। পুরাতন আদর্শগত ঐতিহ্য এখন প্রায় স্মৃতিতে বিলীয়মান, যে প্রবল বিশ্বাসের প্রেরণা সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সহজ ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল সে বিশ্বাস আজ প্রায় অন্তর্হিত। "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রথমেই আজ সংশয়ে, ধিক্কারে প্রশ্নের গুঞ্জন ওঠে মনে—সবার উপরে কোন্‌ মানুষ সত্য ? বড়ো মানুষ ? নেতা ? গুরু ? খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা কিংবা সিনেমার বিজ্ঞাপনে পরিচিত মানুষ ? না সেই সব মানুষ, শিয়ালদ স্টেশনের, বস্তির, বাজারের, স্কুল এবং কলেজের মানুষ, যাদের চোখে সৃষ্টির অঞ্জনের চিহ্নমাত্র নেই ? সবার উপরে মানুষ সত্য ? **সবার উপরে সব মানুষই কি সত্য ?** সেই সত্যের যে ভয়াবহ রূপ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তার সর্বজনীন পরিচয় সাহিত্যকে স্বীকার

করতেই হবে ; এই স্বীকার করার তাগিদ রাজনীতির নয়, উদার মানবধর্মী জীবন-নীতির।

নিছক সাহিত্যিকতা আজ যে পথে চলেছে সে পথ সাহিত্যের, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের সৃজনক্ষমতার প্রতিশ্রুতি বহন করছে না। সাহিত্যাশ্রমে অগ্রজ যাঁরা, যাঁদের অভিজ্ঞতা ও চেতনার শুরু হয়েছিল বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে, তাঁদের জন্য চিন্তার কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ঠিক পর পর সময়ের কথাশিল্পী, কবি এবং প্রবন্ধকারদের চিত্তলোকে স্বাদেশিকতার, সামাজিক দায়িত্ববোধের, সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সুস্পষ্ট সমবেদনার স্বীকৃতি ছিল। এই স্বীকৃতি, সর্বদা কোনো রাজনৈতিক মত আশ্রয় করেনি ; স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং স্বার্থ-সংঘাতে তারাশঙ্কর, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ কৃতী মানবধর্মী শিল্পীরাও কখনও কখনও অসহিষ্ণু হয়েছেন, তাঁদের প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তবু আন্তরিকতাহীন সাহিত্যিকতার মোহে তাঁরা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেন নি। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিক যাঁরা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যের মানবিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেছেন, আজকের সমস্যা এবং সংশয় তাঁদের নিয়ে নয়। সাম্প্রতিক কালে যে সব তরুণ লেখক সাহিত্যাশ্রমে প্রবেশ করেছেন, আপাতঃ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন, তাঁদের চটুল নাগরিকতা, আপাতরমণীয় প্রসাধন-প্রিয়তা দেখে সংশয় হয়। হয়ত, সামাজিক আদর্শের অবক্ষয় এঁদের সাহিত্য-চেতনা ও সাধনাকে কেন্দ্রচ্যুত করছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে নতুন বিত্তশীল শ্রেণীকে আশ্রয় করে 'নাইট্-ক্লাব সাহিত্য', 'চৌরঙ্গী সাহিত্যের' চর্চা অবশ্যই লোভনীয় হয়েছে। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশ অনেক দিন ধরেই ক্রমে

ক্রমে বৃহত্তর জনজীবনের সংসর্গচ্যুত হয়েছে ; রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁরা নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেও এঁদের সৃজনী প্রতিভার গড়ন নিয়েছিল বাংলার জনজীবনের সকল স্তরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ অনুরাগ-সিক্ত সহযোগে। এঁদের সাহিত্য-প্রেরণা তাই আধুনিক অনেক তরুণ সাহিত্যিকের মতন সমারসেট্ ম'ম, ফ্রাঁসোয়া সার্গঁ অথবা অ্যালবার্টো মোরাভিয়ার সুলভ উত্তেজনাপূর্ণ শিল্প-উপকরণ সংগ্রহে উৎসাহী হয় নি। স্বাদেশিকতা এবং সুস্থ কল্পনা-প্রবণ হৃদয়াবেগ ও জীবনের অভিজ্ঞতার উপরেই তাঁদের সৃজনশীল সাহিত্য গড়ে উঠ্‌তে পেরেছে। বুদ্ধদেব বসু 'দেশোত্তর' অথবা বিশ্বজনীন চেতনার স্তুতিবাদ করে 'দেশজ' চেতনাকে সনাতনী বলে চিহ্নিত করেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই অবশ্য দেশোত্তর অথবা বিশ্বজনীন চেতনায় উত্তীর্ণ। তাই বলে র‍্যাঁবো, বোদ্‌লেয়ার অথবা ম'ম এবং মোরাভিয়াকে বাংলা পোশাকে পরিচিত করলেই 'দেশোত্তর' চেতনার উদ্‌বোধন করা হয় না।

এখন যে দুর্বিপাক দেখা যাচ্ছে সাহিত্যিকতা-চর্চার, তার একটি বিষম পরিণাম হল চৌরঙ্গী এলাকার মধ্যে সাহিত্যের সীমা-সংকোচন; দ্বিতীয়টি হল দেশোত্তর অথবা বিশ্বচেতনার নামে সর্বশেষতম য়ুরোপীয় আত্মপরতা ও যৌন-বিলাসের 'দেশজ' পুনরাবৃত্তি। এর সহজ কোনো প্রতীকার নেই।

এখনকার নতুন সমাজ-বিন্যাসে সাহিত্য-সৃষ্টিতে শ্রেণী-বিভেদ ঘটবে এবং ঘটছে এবং তার কারণ রাজনৈতিক তত্ত্বে অনুরাগ-বিরাগ নয়। স্বাদেশিকতার সংকল্প ও প্রয়াস বাঙ্গালী জীবনে যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ সম্বন্ধে আধুনিক কার্টুন কী হতে পারে সে প্রশ্ন ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কালের ধারায় প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের অনেক শেখাবিদ্যা,

বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা আমরা ভুলতে বসেছি। নতুন কোনো বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা জীবনকে মহৎ ও বৃহৎ ভাবে বিস্তৃত করতে পারছে না। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশবিভাগের সময়ে যে সব তরুণ বুদ্ধিজীবী ১০।১৫ বৎসরের বালক ছিলেন তাঁরাই আজকের পরিণত বয়স্ক তরুণ। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তারাশঙ্করের স্বাদেশিকতায় উদ্‌বুদ্ধ মহৎ সাহিত্য-চেতনা এঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে। এঁদের জীবনের অনেকখানি যন্ত্রণাপীড়িত, বিশ্বাসহীনতা ও ব্যর্থতার ভারে কাতর। অথচ সাহিত্য-সৃজন ও সাহিত্য-আস্বাদনের বর্তমান ও আগামী কালের দায়িত্ব অনেকখানি এই স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের নতুন বুদ্ধিজীবীদের উপর। জীবনের জটিলতা ও যন্ত্রণা পরিহার করে সাহিত্যিকতার ভঙ্গীসর্বস্ব সহজ সাধনা এঁদের অনেককেই আকর্ষণ করছে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থার নতুন বিন্যাসও এই ধরনের সাহিত্যিকতাকে নিরাপদ এবং লোভনীয় করছে। এই সাহিত্যিকতা না দেশজ এবং সনাতনী—(সনাতনীরও কিছু সুস্থতা, স্থিতিশীলতা আছে); এবং না "দেশোত্তর, বিশ্বজনীন চেতনার পরিচায়ক"। এ হল "কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটাপাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।" এই জলও স্বাভাবিক নির্মল পানীয় নয়, হয়ত সোডা ওয়াটার অথবা তার চেয়েও মনোহরণ মুহূর্তমাদকতাময় কিছু। (১৯৫৬)

সাহিত্যের রাজনীতি

লেখক, পাঠক, সমালোচক সকলেরই সংকট। সকলেরই সংশয়। কোন্ লেখা ভালো, কোন্ লেখা ভালো নয়, কী জন্য ভালো অথবা মন্দ, ভালো লাগা উচিত কিংবা অনুচিত, তা নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই, তর্কের শেষ নেই। সংকট এবং সংশয় সব লেখক, সব পাঠক এবং সমালোচকের মনকে অবশ্য আলোড়িত করছে না, কোনোকালেই তা করে না। করে না, কারণ, সাহিত্যের গুণাগুণ চুলচেরা বিচার না করেও লেখক এবং পাঠক সাধারণ রসসৃষ্টি এবং রসাস্বাদনের আনন্দ পেয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক সাহিত্য-শিল্পের বিচিত্র সম্পদ পাঠক সাধারণ অনায়াসে উপভোগ করেছে, সাহিত্যিক তত্ত্ব এবং তর্কে উৎসাহিত হয়নি।

আশ্চর্যের কথা নয় যে সাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এ পর্যন্ত স্থির করা যায়নি। রাজনীতির চরিত্র এবং চৌহদ্দি মোটামুটি ভাবে ঠিক করা যায়। সাহিত্যের কোথায় শুরু এবং শেষ, তার উপকরণ ও প্রকরণ, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তাই বা কী এবং কী নয় সে বিষয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। যুগপরম্পরায় চলে আসছে এই সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ; আজকের পৃথিবীতে সে জিজ্ঞাসা যেরকম শাণিত রূপ নিয়েছে তার তুলনা নেই অন্য কোনও যুগে। সভ্যতার সংকট, জীবনের সংকট অগুনতি মানুষের মনে যন্ত্রণা এবং জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছে। লেখক, পাঠক, সমালোচক কেউই সেই জিজ্ঞাসার জটিল চক্র থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারেন না। সাহিত্যের সঙ্গে জীবন-জিজ্ঞাসার নিবিড় সম্পর্ক চিরকালের, এই জীবন-জিজ্ঞাসা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে গেছে সাম্প্রতিক কালে—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে অথবা তার কিছুকাল পরে। ত্রিশ দশকে ধনতন্ত্রের সংকট, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব, সোভিয়েট ইউনিয়নে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস ইত্যাদি বিবিধ কার্যকারণের যোগাযোগে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য নিয়ে আলোচনায় নতুন উৎসাহ দেখা দিল। ত্রিশ দশক থেকে সমাজ-সচেতন সাহিত্য, 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম', শিল্পীর দায়িত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব, তর্ক এবং নীতি-নির্দেশের অনেক মোড় ঘুরে ঘুরে এখন আমরা ঠিক কোথায় যে পৌঁছেছি তা কেউই দৃঢ় ভাবে বলতে পারছেন না। অনেক পুরনো তত্ত্ব এবং নীতি-নির্দেশ ভুলতে হচ্ছে, অথচ সুস্পষ্ট, যুক্তিগ্রাহ্য সাহিত্য-বিচারের কোনো ভূমিকা রচিত হচ্ছে বলা যায় না। সমস্যা ত্রিবিধ—এক হল, অতীতের সাহিত্যকীর্তির গুণাগুণ বিচারের মানদণ্ড কি তা স্থির করা; দুই, সমসাময়িক সাহিত্যপ্রয়াসের মূল্যনিরূপণ; তিন, সৃজনী-সাহিত্য, শিল্পীর উপরে রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ন্ত্রণাধিকার সঙ্গত ও স্বাস্থ্যকর কিনা।

কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোনো মূলগত বিরোধ নেই। তবে রাজনীতি ও সাহিত্যের মূলগত পার্থক্য নিশ্চয়ই স্বীকার্য। রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যের উপরে কোনো কোনো যুগে প্রবল হয়েছে। কোনো কোনো যুগে ধর্মমত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাহিত্যের মূলধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাহিত্যের সামাজিক বনিয়াদ, রাষ্ট্রিক পরিবেশ ও তার প্রভাব মেনে নেওয়া যেতে পারে। তাহলেও স্বীকার করতে হবে সাহিত্যের স্বকীয়তা, নিজস্ব প্রাণস্পন্দন। কাজেই রাজনীতির প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যই সাহিত্য-বিচারের—সাহিত্য ও রসাস্বাদনের মানদণ্ড হতে পারে না।

সাহিত্যের উপর রাজনীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপ অবশ্য ইতিহাসসিদ্ধ ব্যাপার। বিশেষ করে যে-সব যুগে রাজনীতির উপরে ছিল ধর্মতন্ত্রের অখণ্ড আধিপত্য সে সব যুগে সাহিত্যকে বেশ চড়া

হারেই 'সিজারের প্রাপ্য' মিটাতে হয়েছে। এখনও মহামান্য পোপের দপ্তরে 'নিষিদ্ধ' সাহিত্যের তালিকা নিতান্ত ছোট নয়। পোপের হুকুমনামা কোনো কোনো রাষ্ট্রে মেনে চলা হলেও তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পোপ যেমন ক্যাথলিক ধর্মের রীতিনীতি অনুশাসনের কষ্টিপাথরে সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচার করে থাকেন অনেকটা সেই ধরনের কঠোর নীতির মানদণ্ডে সাহিত্য-বিচার অন্যত্রও প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলাফল সাহিত্যের পক্ষে, সাহিত্যসৃষ্টি এবং রসাস্বাদনের পক্ষে ভালো হয়েছে কিনা তা নিয়ে জিজ্ঞাসা এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন সম্প্রতি অনুভব করা যাচ্ছে। মুশকিল এই যে, এ বিষয়ে সাহসিক ভাবে আপ্ত-বাক্যের বিশ্লেষণ করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে, "Literature must become Party literature······· Literature must become an integral part of an organised, planned, united social democratic work." লেনিনের এই উক্তির আক্ষরিক অর্থ বোধ হয়, সাহিত্য পার্টি সাহিত্য হবে। সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী আন্দোলনের পরি-প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনে লেনিন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লেনিন কি বলেছিলেন পার্টি সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য? অথবা সাহিত্যের মূল্য বিচার, রসাস্বাদন পার্টির নীতি-নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে? লেনিন বলতে চেয়েছিলেন সংগ্রামী জনসাধারণের মন থেকে প্রতিবিপ্লবী ভাবধারার প্রভাব দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক প্রয়াস চাই, এবং সে প্রয়াস সংগঠিত ও পরিচালিত হবে পার্টির নির্দেশে। তবে লেনিন এই সঙ্গেই বলেছিলেন, "There is no denying the fact that in this field there must be the widest freedom for individual bents, free swings for thought and

imagination, form and content." সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র রচনা যতটা সহজ কার্যতঃ তার প্রয়োগ তত সহজ নয়। পরিণাম কী হয় সম্প্রতি তা নিয়েও আলোচনা প্রখর হয়েছে।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও বিশেষ কয়েকটি দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব ও মতামত খুব সুস্পষ্ট ছিল না। অথবা যেটুকু সুস্পষ্ট ছিল তা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার পুনরুক্তি মাত্র। একটানা, একরঙা চরিত্র-চিত্রণ, একই ধরনের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যের অতিকথনে আমাদের সাহিত্যিক রুচি অতৃপ্ত পীড়িত বোধ করলেও তথাকথিত সমাজ-বাদী বাস্তবতার এই মস্ত অভাব নিয়ে সামান্যই আলোচনা করা হয়েছে। তার কারণ সাহিত্যের রাজনীতি। এই রাজনীতির মোটা লাইন টানা ছিল—ভালো এবং মন্দ। 'সোসালিস্ট রিয়ালিজমের' ছাপ যে সাহিত্যের উপরে তা নির্বিচারে ভালো অথবা একেবারে ভালো না হলেও তার মধ্যে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট। শেষের উক্তিটি কতকটা সত্য। কিন্তু তাতে সাহিত্য-বিচারের মৌলিক অসঙ্গতি দূর হয় না। সে অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা সম্প্রতি হয়তো শুরু হয়েছে। সোভিয়েট আর্টিস্ট কংগ্রেসে কিছুকাল পূর্বে শেপিলভও বলেন, "We do not want to prescribe to the artists what themes they should or should not take." কোন্ বিষয়ে সাহিত্যিকেরা লিখবেন অথবা লিখবেন না তার নির্দেশ দেওয়া হবে না। তবে সাহিত্যিকমাত্রেই 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের' আদর্শ অনুসরণ করবেন। এই আদর্শ হল "truthful, historically concrete depiction of reality in its revolutionary development." তবু সমস্যা হল এই সাধারণ সূত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগ কী ভাবে হবে। প্রথমতঃ মার্ক্সবাদীরা জানেন 'রিয়ালিটি' অর্থাৎ বাস্তব একটি জটিল এবং নিত্যগতিশীল

প্রবাহ। বস্তুজগৎই হোক আর জনসমষ্টিই হোক, তার ঐতিহাসিক স্বরূপের বৈপ্লবিক বিবর্তন যথার্থ এবং জীবন্তভাবে বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের' এই সাধারণ সূত্রে আর্ট এবং বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকছে কিনা সেটিও বিচার্য। বিজ্ঞানের একটি কাজ হতে পারে, 'truthful, historically concrete depiction of reality in its revolutionary development.' আর্ট তথা সাহিত্যের প্রকৃতি ও রীতি সম্বন্ধে ধারণায় কোন যান্ত্রিক ত্রুটি থাকছে কিনা তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অনেক সময় বলা হয় আর্ট বা সাহিত্য হল সমাজ বা প্রকৃতির দর্পণ। লক্ষ্য করা যেতে পারে সে 'দর্পণ' উপমাটির সঙ্গে 'truthful, historically concrete depiction of reality' সাধারণ সূত্রের এই অংশটুকুর মিল আছে। 'রিয়ালিটি' অর্থাৎ বাস্তবের বৈপ্লবিক বিবর্তন ('its revolutionary development') বর্ণনা করার যে দায়িত্ব সংযুক্ত হচ্ছে সেটি হল বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর। এই বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐতিহাসিক প্রয়োজন এবং সার্থকতা সম্বন্ধে সংশয় না থাকতে পারে। সংশয় হল সৃজনশীল সাহিত্য রচনার প্রয়াসের সঙ্গে এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত করা যাবে কি উপায়ে? যদি বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি সাহিত্যে প্রাধান্য পায় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় 'রিয়ালিটি'র বৈপ্লবিক বিবর্তন রূপায়িত করার দায়িত্ব তা হলে সাহিত্যের রসাত্মক প্রেরণা ও আবেগ স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হয় কিনা এইটিই 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের' মৌলিক সমস্যা। একথা ঠিক যে, এই সমস্যা বারবার প্রগতিবাদী সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মূল প্রশ্নরূপে দেখা দিচ্ছে। সূত্রের পর সূত্র রচনা করে অসঙ্গতি ও বিরোধের সমন্বয় চেষ্টা হচ্ছে।

'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজিমের' সাধারণ সূত্রে যে 'truthful,

historically concrete depiction of reality'র কথা বলা হয়েছে সে কার truth? শিল্পের সত্য অথবা শিল্পীর সত্যোপলব্ধির রূপটি দর্পণের প্রতিবিম্বিত—সত্য (truth) নিশ্চয়ই নয়। 'Art is nature (or life) seen through a temperament' উক্তিটিতে অন্ততঃ দর্পণ প্রতিবিম্বের যান্ত্রিকতা দোষ নেই। প্রকৃতিকে, বহির্জগৎকে, জীবনকে বিশেষ একটি মেজাজ নিয়ে দেখা এবং প্রকাশ করা হল আর্ট। একথা যদি মানি—এবং না মেনে উপায় নেই —তাহলে 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর সংজ্ঞানুযায়ী 'truthful··· depiction' ইত্যাদির মধ্যে শিল্পীর মেজাজকে মানতে হবে। এই মেজাজ কেবল দেখে না, যা দেখে মাত্র তাই-ই প্রকাশ করে না, দেখা এবং না-দেখাকেও তার মেজাজমত কল্পনা ও অনুরাগ দিয়ে নতুন গুণ ও গড়ন দিতে পাবে। শিল্পীর মেজাজ অবশ্য ভুঁইফোড় কিছু নয়, সামাজিক পরিমণ্ডলেই তার জন্ম এবং বিকাশ-বৈচিত্র্য।

শিল্পীর মেজাজ সুস্থ অথবা বিকারগ্রস্ত কিনা সে বিচার পরে। শিল্পসৃষ্টির স্বচ্ছন্দ প্রয়াসকে গোড়াতেই কতকগুলি নিয়মবন্ধনে বাঁধলে, শাসনের ভীতিগ্রস্ত করলে যা ফল পাওয়া যায় তার সাময়িক রাজনৈতিক মূল্য থাকলেও থাকতে পারে, স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য নামমাত্রও থাকে না।—শেপিলভও 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের' সাধারণ সূত্র অক্ষুণ্ণ রেখে বলেছেন—'there can and should flourish different creative types, a multiplicity of form, a variety of individuality' তবে এই শর্তে যে, ('provided that) the artist serves by his works the great ideals of emancipation, the erection of a truly humane and harmonious order, assists the aesthetic education of people,' ইত্যাদি। শর্তে বর্ণিত আদর্শ উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে কোনো আপত্তি হবে না। মহৎ সাহিত্য, সৎ সাহিত্যের আদর্শ সাধারণ-ভাবে সব যুগে এবং সব দেশেই প্রায় ঐ রকম। প্লেটোর দাবি

ছিল, 'art must serve politics, morals, religion.' মিল্টন সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর কাব্য ঈশ্বরের বিধানগুলির যথার্থতা প্রতিপাদন করবে মানুষের কাছে ('justify the ways of God to man.')। তবে ধর্মতত্ত্ব, নীতিকথা, রাজনীতি— কোনোটিরই সাহিত্যের উপর একাধিপত্য সুস্থ আনন্দদায়ক নয়। সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক উন্নতি, সামাজিক মঙ্গল ইত্যাদির উদ্দেশ্য সরাসরি কঠিনভাবে সংযুক্ত করলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা সাহিত্যের পক্ষে ভালো নয়, সমাজের পক্ষেও নয়। সাহিত্যের উপরে নীতিগত অভিভাবকত্ব যে ভালো নয় শেপিলভও তা প্রায় মেনে নিয়েছেন মনে হয়, কারণ তিনিও বলেছেন, 'there should be less moralizing tutelage.' কিন্তু একবার সাহিত্যশাসন-ব্যবস্থা চালু হলে সহজে তা লোপ পাওয়ার নয়। এখনও তাই দেখা যাচ্ছে। (১৯৫৬)

রাজনীতির সাহিত্য

কবিতা এবং পলিটিক্স—বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর ধ্যানধারণা নাকি এই যুগল মানসীতে সমর্পিত। কবিতা লেখা হয়; পলিটিক্স করা হয়। কিম্বা করার ভান এবং ভণিতায় নিয়মরক্ষা হয়। রাজনীতির উপরে বাঙ্গালীর অনুরাগ প্রবল, সোচ্চার; মাঠে ময়দানে, খবরের কাগজে, আইন সভায় তার অজস্র প্রাত্যহিক পরিচয়। কিন্তু রাজনীতির সাহিত্যে অনুরাগ কোথায়, কতখানি? এ বিষয়ে আমরা কিছু ভেবেছি বলে মনে হয় না। আগেই বলেছি, রাজনীতি করা হয় বেশী; লেখা হয়, আলোচনা হয় সামান্যই। কাব্যলক্ষ্মী অকৃপণ, বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর প্রতি তাঁর প্রসন্ন-দাক্ষিণ্য অনেককাল ধরেই অবারিত; তার উপর কথাসাহিত্যের নতুন ফসলে আমাদের ছোটো সোনার তরী ভর ভর। এদিকে রাজনীতির উপরে আমাদের অনুরাগ যতখানি, ঠিক ততখানিই যেন বিরাগ এবং উদাসীনতা রাজনীতি অনুশীলনে সৃজনে। সাহিত্যের রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি হয়েছে অনেক, রাজনীতির সাহিত্য উপেক্ষিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। খবরের কাগজের কথা বাদ দেওয়া যাক; সমসাময়িক ঘটনাবলীর দৈনন্দিন বর্ণনা এবং তার উপরে ছোটোবড়ো মন্তব্য রাজনীতি সম্পর্কিত হলেও, খবরের কাগজকে রাজনীতির সাহিত্য বলা চলে না। মাসিক এবং সাপ্তাহিক যে-সব পত্রিকাগুলি বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীর ভাবনা-চিন্তার প্রয়াস ও পরিচয়ের নিদর্শন দেয় সেগুলিতে রাজনীতি আলোচনার চিহ্ন যৎসামান্য। আমরা অনেকেই যেন ধরে নিয়েছি মনে মনে, রাজনীতির আবার সাহিত্য কি, রাজনীতির মৌলিকতত্ত্ব

আলোচনার প্রয়োজনই বা কি! সব তত্ত্ব এবং সমস্যার চূড়ান্ত বিচার ত হয়েই গেছে—এক রাজনীতি হল প্রগতিপন্থী, সমাজবাদী; আর এক রাজনীতি হল প্রতিক্রিয়াশীল, পুঁজিবাদী। অতএব আমাদের সাহিত্য-পরিক্রমায় রাজনীতির সরাসরি প্রবেশ নিষেধ কিংবা নিষ্প্রয়োজন। আসলে কিন্তু আমরা মনে মনে মোটেই ধরে নিইনি, নিতে পারি না যে, রাজনীতির সমস্যা সবই মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স ইত্যাদিরা সমাধান করে গেছেন, শেষ উত্তর জানা হয়ে গেছে এবং সেজন্য রাজনীতি হল শুধুমাত্র করার ব্যাপার। আর সেই করার ব্যাপারের জন্য প্রোগাম পলিসি-রচনা, ব্যাখ্যা এবং প্রচারই যথেষ্ট। রাজনীতির সাহিত্য যে আমরা বুদ্ধিজীবীরা রচনা করতে পারিনি, করতে অগ্রসর হইনি, তার কতকটা কারণ হয়ত মানসিক জড়ত্ব এবং আলস্য। তবে এই-ই মুখ্য কারণ নয়। সাহিত্যের রাজনীতি চর্চায় মানসিক জড়ত্ব বা আলস্য দেখা যায় নি; কাব্য এবং কথাসাহিত্যের অনুশীলনে উৎসাহ এবং উদ্যম কম হয়নি। কুণ্ঠা এবং কৃপণতা দেখা যাচ্ছে কেবল রাজনীতির সুচিন্তিত বিস্তৃত আলোচনায়।

আমাদের মধ্যে এক ধরনের সহজিয়া সাধনার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। "সহজ সুরে সহজ কথা" শুনিয়ে দেবার জন্য আমরা বড়ো বেশী আগ্রহী। জীবনের কঠিন ও রূঢ় বিষয়গুলিকে, এর জটিল জিজ্ঞাসাগুলিকে, হয় আমরা পরিহার করছি, না হয় কয়েকটি সহজ 'মেড ইজি' ধরনের ফর্মুলায় পর্যবসিত করতে চাইছি। উপনিষদের ধর্মজ্ঞানীরাও জানতেন সাধনার পথ দুর্গম— "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"। আমরা কেন হব জীবনসাধনায় ফাঁকির বেপারী? আমাদের সাহিত্যও তাই মননশীলতা, চিন্তাশীলতা, দার্শনিকতার শ্রমসাধ্য পথ এড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগ প্রকাশের মধ্যেই মোটামুটি নিজেকে নিঃশেষিত করে ফেলছে। তাই আমরা সভাসমিতিতে ভাষণ-পটু, কিন্তু প্রবন্ধরচনায় ব্যর্থ।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করার ফলে যে আত্মপ্রত্যয় জন্মে, আমাদের জাতীয় জীবনে আজ তার অভাব। রাজনীতির মধ্যেও এই প্রত্যয়ের অভাব, এবং তারই ফলে অনুকরণ আমাদের প্রধান পুঁজি। রাজনীতিতে আমরা অনুকারক, সাহিত্যে আমরা অনুবাদক—এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে রাজনীতি এবং সাহিত্য দু'য়েরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অনুকরণ নয়, অনুশীলন,—অনুশাসন নয়, অনুধাবন; তবেই নূতন জীবন এবং নূতন মননশীল গদ্য-সাহিত্য সম্ভব।

জিজ্ঞাসা যেখানে স্তব্ধ, সেখানে মননশীল সাহিত্যই শুধু নয়, সমাজপ্রগতিও "অন্ধং তমঃ প্রবিশতি"। সমাজে নাগরিকবোধের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে; ক্রিয়াকর্মে আইন সংযমও অনাবশ্যক নয়। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োজন কিন্তু সাহসিকতার; যা আছে তাই ঠিক আছে, এ হচ্ছে চরম জড়তার মনোভাব। যা আছে তা হয়তো ঠিকই আছে, তবু এই সব থাকার মধ্যেও কী নেই, বা আরো কী রকম থাকা সম্ভব এই ধরনের দার্শনিক চিন্তার অনুশীলন সব দেশে সব যুগে এবং সব সমাজব্যবস্থাতেই প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের রাজনৈতিক দৈন্য সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবীরা সকলেই সচেতন না হলেও, কিছু কিছু মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে সম্প্রতি। ছোটোবড়ো মাসিকপত্র এবং সাপ্তাহিকের যৌবনজল-তরঙ্গ আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করবার মতো। তরঙ্গ ঠিক নয়, হয়ত বুদ্‌বুদই অনেকগুলি। সবগুলি কাগজ একসঙ্গে মিলিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে রাজনীতি নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধের সংখ্যা নামমাত্র। গল্প, উপন্যাস এবং কবিতা স্বভাবতঃই সংখ্যায় প্রচুর। এর উপরে কিছু রম্যরচনা, আর হয়ত পুরাতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে দু'চারটি প্রবন্ধ। সাময়িকপত্র-পত্রিকার প্রধান উপজীব্য হল কথাসাহিত্য, তারপর কবিতা ও রসরচনা। বৃহদায়তন জনপ্রিয় কাগজগুলির ব্যবসায়িক লক্ষ্য

স্বভাবতঃই হল পাঠক সাধারণের সুলভ মনোরঞ্জন। কিন্তু অন্য যে-সব কাগজ উৎসাহী বুদ্ধিজীবী তরুণেরা কেবলমাত্র নিজেদের উদ্যমের উপর নির্ভর করে লাভ-লোকসানের প্রশ্ন উপেক্ষা করে চালান সেগুলিরও ঝোঁক কেন এই অল্প ভাবনার সাহিত্যের উপরে? বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর-প্রমথ চৌধুরী যে সাহিত্যাদর্শ অনুশীলন করে গেছেন তার সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য-প্রচেষ্টার বিরাট ব্যবধান ঘটেছে। অথচ বঙ্গদর্শন-সাধনা-সবুজপত্রের যুগের চেয়ে আমাদের যুগ অনেক বেশী রাজনীতি-সচেতন। তফাৎ এই, সে যুগের চিন্তাশীল লেখকেরা কেবলমাত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন নি, তত্ত্ব আশ্রয় করেন নি; তাঁরা চিন্তাকে প্রসারিত করেছেন, যুক্তি ব্যবহার করেছেন চিন্তার ভিত্তি রচনায়। বঙ্কিম রচনা করেছিলেন 'সাম্য'; আমরা 'সাম্যবাদীর ইস্তাহার' অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হয়েছি। বঙ্গদর্শন, সাধনা ও সবুজপত্র সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্যপত্র ছিল না। বঙ্গদর্শনে যে দর্শন ছিল তা আজকের বিচারে যতই অসম্পূর্ণ মনে হোক না কেন, স্বাধীন চিন্তার প্রয়াসে সে দর্শন বিশ্বের সঙ্গে বঙ্গজীবনকে যুক্ত করেছিল। সবুজপত্রের রঙেও রাজনীতির ছোপ ছিল; যে রাজনীতি গোষ্ঠিত নয়, পলিটিক্স করার সঙ্গে যে পলিটিক্সের স্বচ্ছ ভাবনা-আলোচনার যোগাযোগ প্রয়োজন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সবুজপত্র। 'রায়তের কথা'য় যে আলোচনা শুরু হয় তার দীপ্ত মননশীলতা এখনও অম্লান রয়েছে বলা যায়। বঙ্গদর্শন, সাধনা, সবুজপত্র ছাড়াও অন্যান্য সাময়িকপত্র, যথা, নব্য ভারত, গৃহস্থ, ভাণ্ডার ইত্যাদিতেও রাজনীতির সাহিত্য অনেকখানি স্থান পেয়েছিল। আরো পরের যুগের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'বিজলী', 'আত্মশক্তি' রাজনৈতিক আলোচনায় ভাবের জোয়ার এনেছিল। এরকম আরো অনেক কাগজের নাম করা যায় যারা সাহিত্যের চৌহদ্দি আজকের মত সংকীর্ণ করে নি।

অথচ আজকের দিনেই রাজনীতির সাহিত্যের প্রয়োজন আরো বেশী হয়েছে। দেশ স্বাধীন হল; গণতন্ত্র, পার্লামেণ্ট, সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, 'সোস্যালিস্ট প্যাটার্ণ' ইত্যাদি অনেক রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং প্রকরণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসে পড়ল, ভাবনা-চিন্তার বিষয় হল। তবু গত আট বৎসরে এর কোনো একটি বিষয় নিয়ে রীতিমত মৌলিক আলোচনা বাংলা কোনো কাগজে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কার্লাইল, রাস্কিন, কিংসলী, মরিসের নাম করব না; তাঁরা রাজনীতির সাহিত্য রচনায় যে কৃতিত্ব ও কল্পনার প্রসার দেখিয়ে গেছেন তার কাছাকাছি পৌঁছুনো আমাদের সাধ্যাতীত। অথচ সামাজিক দুর্গতির যে করুণ ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছিল ব্রিটেনে গত শতাব্দীর 'ক্ষুধার্ত চল্লিশে', আমাদের আজকের সামাজিক জীবনে দুর্গতি এবং সঙ্কট তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে তার গভীর গম্ভীর বেদনাময় ক্রোধের প্রতিফলন কই? আমাদের রাজনীতির সাহিত্যে এই দুর্গতি ও সঙ্কটের সুষ্ঠু সুবিস্তৃত আলোচনা ও জিজ্ঞাসার প্রয়াস কই? আমাদের বুদ্ধির অসাড়তা, ভীরুতা কেন ঘটল? বাস্তব-জীবননিষ্ঠ রাজনীতির সাহিত্য রচনার স্থান কেন অধিকার করল সুদ্ধমাত্র মন্ত্রের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি? আমাদের বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতি চর্চা কেন অনেকাংশে হয়ে রইল রাজনৈতিক-ভঙ্গীসর্বস্বতা অথবা রাজনৈতিক-আনুগত্য স্বীকারের ক্লান্তিকর পুনরুক্তি?

(১৯৫৫)

উপন্যাসের উপসংহার

সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যের যুগ মাঝে মাঝে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যেতে দেখা গেছে। নাটক—অন্ততপক্ষে অভিনয়ের উপযুক্ত নাটকের অজন্মা হয়েছে; গল্প-উপন্যাসের চাহিদা এবং যোগান কিন্তু বড় একটা কমতে দেখা যায় নি গত তিন শতাব্দীর মধ্যে। আর এই বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে গত পঞ্চাশ অথবা একশ বছরের সাহিত্যিক প্রয়াসের হিসাব নিতে গেলে দেখা যাবে, উপন্যাসের চাহিদা এবং চলন বেড়ে চলেছে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রায় সমান তাল রেখে। সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস অপেক্ষাকৃত নবাগত একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধজাতক, ঈশপের গল্প অথবা আরব্যরজনীর কাহিনী-মালার বয়স কম না হলেও, গদ্যে গল্প বলার রীতি সাহিত্যের জাত-বিচারে কুলীন পদবাচ্য নয়। এখন অবশ্য তার কৌলীন্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে; সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে, জনপ্রিয়তায় উপন্যাসের প্রতিপত্তি এখন কবিতা ও নাটককে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। কবিতার ফসল যেন সব ঋতুর উপযোগী নয়, নাটক তার চেয়েও বেশী আবহাওয়া-নির্ভর। একমাত্র গল্প-উপন্যাসই বারোমাসের ফসল এবং বারো হাজার রকমের রুচিকে তৃপ্তি দেবার মতো তার উপকরণ ও আয়োজন।

প্রথমে গল্প তারপর উপন্যাস; ছোটো থেকে বড়ো, কিন্তু ছোটোকে টেনে-বুনে বড়ো করে উপন্যাস তৈরী হয় নি। এক হিসেবে উপন্যাসই ছোটো গল্পের অগ্রজ। উপন্যাসের সঙ্গে মিল হল এপিকের; ছোটো গল্পের সঙ্গে কাব্যগাথার, 'ব্যালাড' ও এপিকের ভগ্নাংশের। মিলটা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়।

টলস্টয়ের 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'কে হোমারের ইলিয়াডের পাশে দাঁড় করালে একেবারে বেমানান হয় না বটে, তবে দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল কেবল বিস্তৃতির, বিরাট চিত্রপটের; বৃহৎ এবং মহৎ উপন্যাসের কিছু কিছু এপিক লক্ষণ সুস্পষ্ট হলেও, উপন্যাস উপন্যাসই; তার কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, বর্ণনা ও বিশ্লেষণে জীবনস্রোতের গতি এপিকের চেয়েও আরও বেশী তীব্র, আরও বেশী আবেগসঞ্চারী। পুরাকালে বা মধ্যযুগে কাহিনী ছিল, বর্ণনা ছিল, ছিল না কিন্তু চরিত্র চিত্রণে অন্তরঙ্গ পরিচয়। যারা ছিল তাদের মন সবটাই প্রতিফলিত হত মুখে। নরনারীর আত্মসচেতনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ দিয়ে বোধ হয় উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ নির্ধারিত হল।

এসব অবশ্য পুরোনো কথা। কোনো একটি লক্ষণ দিয়েই এখন আর উপন্যাসকে চিহ্নিত করা যায় না। গত একশ বছরে উপন্যাসের উপাদানসংগ্রহে ও শিল্পকৌশলে এত রকমের পরিবর্তন হয়েছে যে এখন বলাই যায় না, উপন্যাসের মৌলিক প্রকৃতিটা কী। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব,—মানুষের মনে ও জীবনে যা কিছু কোনো না কোনো রকমে স্থির অথবা অস্থির, লঘু কিংবা গুরু অনুভবের বৃত্ত রচনা করেছে তা সবই উপন্যাসের উপজীব্য। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, উপন্যাসও কাব্যলক্ষণা-ক্রান্ত, তার কারণ সুদূর অতীত এবং সুদূরতম ভাবী কাল, খুব কাছের এবং খুব দূরের সবই উপন্যাসের আয়ত্তে আনা যায়। আবার আর একদিক দিয়ে, আধুনিক কালের উপন্যাস বিজ্ঞানের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস করেছে এবং কখনও কখনও সফল হয়েছে। উপন্যাস হল মানুষকে, জীবনকে, পৃথিবীকে উল্টে পাল্টে, ভিতর থেকে, বাইরে থেকে অজস্র রকমে দেখবার ও দেখাবার উপায়।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না, উপন্যাসের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। অন্তত বাংলা সাহিত্যে তো নয়ই।

তবুও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে উপন্যাসের দিন ফুরিয়ে এসেছে, তার অন্তিমকাল আসন্ন। মানুষ যখন ফুরিয়ে আসে নি, এমন কি পারমাণবিক অপমৃত্যুর বিভীষিকা সত্ত্বেও, তখন উপন্যাসের উপসংহার কল্পনা করা সহজ নয়। তবু প্রশ্ন উঠেছে। নিছক সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে উপন্যাস সৃষ্টির প্রাচুর্যের অভাব ঘটে নি, তবে এই প্রাচুর্যে ভেজাল আছে নিশ্চয়ই। রীতিমত বিচারে ভালো উপন্যাসের সংখ্যা সম্ভবত হাতে গোনা যায়। সিরিল কনোলী শ্লেষের মাত্রা একটু বাড়িয়ে বলেছেন, সামান্য সংখ্যক ভালো উপন্যাস বাদ দিলে যা থাকে সে হচ্ছে ইংরেজী এবং আমেরিকান উপন্যাস। ওই রকম আর একজন অপ্রিয়-ভাষী সমালোচক, এডমাণ্ড উইলসন, বলেছেন, উপন্যাস হচ্ছে দুইজাতের : এক হল চিরায়ত—'ক্লাসিক্স্'—যার সংখ্যা বেশী নয়; আর হল অগুন্‌তি পেশাদারী গল্প—'কমার্শিয়াল্‌স্'। কুশলী ইংরেজ এবং আমেরিকান কথাশিল্পীর অভাব ঘটে নি, তাঁদের সাময়িক সাফল্যও কম নয়। বেশ কিছুদিন আগের ইংরেজী হিসাবে প্রত্যেক একশ-খানা বইয়ের ষাটখানা হল উপন্যাস, এর মধ্যে কমপক্ষে ত্রিশ-খানাই বোধ হয় রহস্য রোমাঞ্চের জনপ্রিয় কাহিনী। তবু সম্প্রতি কোনো কোনো ইংরেজ প্রকাশক আশঙ্কা করেছেন যে, উপন্যাসের চাহিদা কমছে। তবে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা অল্প হলেও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কমেছে বলে মনে হয় না।

'সাহিত্যে সংকট'কার অন্নদাশংকর অবশ্য বলেছেন, উপন্যাসের উপাদান পর্বতপ্রমাণ স্তূপাকার হয়ে উঠেছে কিন্তু উপন্যাস হচ্ছে না। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সংকট যদি দেখা দেয় তবে সেটা উপাদানের অনটনের জন্য নয়। উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কমবার সম্ভাবনাও এখানে কম। আমাদের কথাশিল্পীদের যাত্রা সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত একটি পর্বে

বাংলা উপন্যাসের বিস্তার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। দ্বিতীয় পর্বের অগ্রণীদের নাম উল্লেখ করতে দ্বিধা বোধ করছি, কারণ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে।

এখনকার কথাশিল্পী যাঁরা তাঁদেরও অনেকের কল্পনা, কৌতূহল এবং শিল্পকৌশলে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সরকারী দাক্ষিণ্যের অথবা ছায়াচিত্রের নগদ লাভের প্রত্যাশায় উপন্যাসের ভবিষ্যৎ এখানেও সংকটাপন্ন হওয়ার কিছু কিছু আশঙ্কাজনক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ সংকট প্রতিরোধ করার উপায় আছে। উপন্যাসের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে পাঠক সাধারণের রুচিপ্রকৃতির উপরে। নিতান্ত অবসর-বিনোদনের হাল্কা ঘুমপাড়ানী কথা-সাহিত্য কিছু পরিমাণে জনপ্রিয় থাকবে সবদেশেই। তাই বলে উপন্যাসের উৎকর্ষ, তার শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ কেবলমাত্র সাময়িক জনপ্রিয়তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না, তা কোনো দিন হয়নি। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাথ, টমাস হার্ডি অথবা টমাস মান খুব বেশীদূর উঠতে পারেন নি। তাঁদের জনপ্রিয়তার সংখ্যাগত হিসাব দিয়ে উপন্যাসের ভাগ্য বিচার করলে বলতে হত উপন্যাসের মৃত্যু বহুদিন আগেই ঘটেছে।

উপন্যাসের জীবন-সংকট নিয়ে যে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে তার কারণ শুধু উপন্যাসের কাটতির কম-বেশী নয়। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক বলেছেন, "স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা উপন্যাসের বদলে সংবাদ সংকলন করছি, জীবনকে শিল্পরূপ দিচ্ছি সাংবাদিকের মত টুকরো টুকরো খবর সাজিয়ে। তার কারণ সত্যিই আমাদের সৃজনক্ষমতা স্তিমিত, দুর্বল হয়ে পড়েছে।"

উপন্যাসের সংকট বাইরের নয়; শিল্পীর সঙ্গে সমসাময়িক জীবনের যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে নানা কারণে। কোনো কোনো লেখক তাই অতীতের ঐতিহাসিক স্মৃতি আহরণ করে কল্পনার সৌধ রচনা করছেন। সম্প্রতি যে ধরনের 'পিরিয়ড নভেল'

রচনায় উৎসাহ দেখা গেছে তার মধ্যে জীবনবোধের চাইতে কল্পনা-বিলাসের ঝোঁক বেশী। শিল্পকৌশলের নিদর্শন কিছু কিছু আছে, কিন্তু যে পরিমাণ ধৈর্য এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকলে অতীত ইতিহাসের কঙ্কালে জীবনপ্রতিষ্ঠা করা যায় তার অভাব সুস্পষ্ট।

উপন্যাস যদি সামান্য উপকরণ নিয়ে তার উপর কাব্যের, ভাবোচ্ছ্বাসের মোহ বিস্তার করে সুলভ জনপ্রিয়তা পেতে চেষ্টা করে তাহলে হয়তো উপন্যাসের বিপর্যয় রোধ করা যাবে না। সিনেমা এবং টেলিভিশনের প্রসারে অনেক দেশে উপন্যাস-পাঠকের সংখ্যা কমেছে। আমাদের এই ব্যস্ত-সমস্ত সমস্যাসংকুল যুগে দীর্ঘ পুরাপ্রস্থ উপন্যাস পড়ার প্রয়াস অনেকের কাছে কষ্ট-সাধ্য মনে হচ্ছে। সিনেমার চোখঝলসানো মনমাতানো কাহিনী অল্প সময়ে যে আনন্দের শিহরণ দেয় তা ক্ষণস্থায়ী। তবে অনেকের কাছে আজ মনে হচ্ছে ক্ষণভঙ্গুর জটিল পরিবেশ থেকে মনকে মাঝে মাঝে সরিয়ে নিয়ে সিনেমায় মুহূর্তের মাদকতা যে আনন্দ পাওয়া যায় তাই-ই যথেষ্ট। তা ছাড়া কথাশিল্পের আঙ্গিক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপন্যাসের দৃঢ়ভিত্তিকে দুর্বল করেছে। পাঠক বিভ্রান্ত, বিরক্ত হয়েছে কাহিনী এবং চরিত্রের অস্পষ্ট, অর্থহীন অথবা দুরূহ জটের মধ্যে পথ হারিয়ে। কোনো কোনো সমালোচক বলছেন, ইংরেজী উপন্যাসের সাম্প্রতিক দৈন্যদশার কারণ হল, কোনো কথাশিল্পীই যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাসংকুল জীবনকে শিল্পরূপ দিতে অগ্রসর হন নি। তবু উপন্যাসের অন্তিমকাল আসন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। সিনেমা-টেলিভিশনের অনুরাগীদের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, ছায়াছবির ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধ আবেগ কখনও উপন্যাসের বিচিত্র, জটিল এবং বহুবিস্তৃত কল্পনা ও ভাবনার দৃঢ়স্থায়ী আনন্দের আস্বাদ দিতে পারবে না।

(১৯৫৬)

কেন লিখি—কারা পড়ে ?

ত্রিশ্‌দশকে লেখক মহলে একটি প্রশ্ন যথেষ্ট আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। সেটি হল, "কেন লিখি ?" প্রগতিবাদ এই প্রশ্নের সূত্র ধরে সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎসাহের বশে অতীতের ঐতিহ্যকে প্রায় ষোলো-আনা বরবাদ করে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়বার ঝোঁকও দেখা গিয়েছিল। সেই ঝোঁকটি সুস্থ ছিল না, একথা অনেক ঠেকে ঠেকে, বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে প্রগতিবাদী লেখকেরা পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছেন। কেন লিখি এবং কার জন্য লিখি, এই প্রশ্নগুলিরও উত্তর অনেকটা সরল হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে কেবল বুদ্ধিগত ভাবে। মনে হয়, প্রগতিবাদী ও সনাতনপন্থী দুয়েরই সমস্যা হল, কি করে জীবনদর্শনকে বাঁধালাইনে পুনরাবৃত্তি ও রোমন্থনের এক-ঘেয়েমি থেকে, অর্থহীনতা থেকে মুক্ত করা যায়। প্রগতি মানে কয়েকটি স্লোগান, কিছু নতুন মাল-মসলা, জনগণের নাম উচ্চারণ অথবা তাদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে দরদী কথা এবং অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু গরম গরম বচন, এইগুলির রাসায়নিক মিশ্রণ নয়। কেন লিখি, কার জন্য লিখি, এই প্রশ্নের প্রগতিবাদী উত্তর বাস্তবক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে, গৃহীত হয়েছে, একথা ঠিকই। কিন্তু কি লিখি, কারা পড়ে এবং ফল কি হয় এসব প্রশ্নের সদুত্তর সমাজ-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সন্ধান করা দরকার। আশঙ্কা হয় যে, প্রগতিবাদ একটা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। অনেক লেখক মনে মনে কতকটা ধারণা করে নিয়েছেন, তাঁদের উদ্‌যোগ এবং উদ্যমের অভাবেই, যে, প্রগতিবাদী ভাবধারা তাঁদের সাধ্যমত প্রকাশ

করলেই যথেষ্ট কাজ হল। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাবধারা হচ্ছে বিদেশী লেখকদের প্রাণহীন অনুকরণ অথবা অনুবাদ। সেই লেখকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যে মানস সম্পদ জন্ম নিয়েছে তার মূল্য যথেষ্ট হতে পারে, তা থেকে আমরা প্রেরণা অবশ্যই নিতে পারি। কিন্তু তাকে দেশী ভাষার পোশাক পরালে প্রগতি হতে পারে না। এই রকম করা হচ্ছে বলে আমাদের প্রগতিবাদী প্রচেষ্টা অনেকটা সনাতনপন্থী ধর্মাচরণের মত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। যেটা ঘোরতর সংশয় ও নিরাশার বিষয় বলে মনে হচ্ছে সে হল প্রগতিবাদী লেখকেরা গীতায় বর্ণিত কর্মে অধিকার আছে, ফল কী হয় না হয় তাতে কিছু যায় আসে না কতকটা এই ধরনের ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। লেখকেরা ছোটো ছোটো গোষ্ঠী ও চক্রে বিভক্ত, সনাতনপন্থীদের প্রতি তাঁদের বিরাগ যেমন সুস্পষ্ট নিজেদের মধ্যে বিরোধ এবং অশ্রদ্ধাও তেমনই প্রবল।

কেন লিখি—প্রশ্নের উত্তর অবশ্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু কারা পড়ে, কতজন পড়ে, ফল কি হয় এই সব প্রশ্ন প্রগতিবাদী লেখকেরা প্রায় এড়িয়েই চলেছেন। মাসিক পত্র ও সংকলনের ছড়াছড়ি। কিন্তু প্রগতিবাদী তালিকাভুক্ত লেখক ও কিছু রাসায়নিক ফর্মুলা সংগ্রহ করে প্রগতিবাদের 'সাহিত্যিক' কর্তব্য শেষ করা হচ্ছে। প্রগতিবাদীরা যদি আত্ম-সর্বস্ব রোমান্টিক হন তাহলে অবশ্য নিজেদের কল্পনা-প্রয়াস থেকে আনন্দের শিহরণ পেতে পারেন। নিজেদের করতালিতে নিজেরা সন্তোষ লাভ করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন এখানে বৃহত্তর ক্ষেত্রের—কেন লিখি, কার জন্য লিখির চেয়েও ভাববার কথা, কঠোর বাস্তবতার মানদণ্ডে বিচার করার কথা হল—কারা পড়ে, কতজন পড়ে, পড়ার ফল কী হয়। আমার দৃঢ়ধারণা প্রগতিবাদী পাঠকশ্রেণীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না, প্রায় কুড়িবৎসরের প্রগতিবাদী সাহিত্য-প্রচার, কল্পনা এবং চেষ্টা সত্ত্বেও। লেখকেরা নিরুৎসাহী হচ্ছেন,

পাঠকশ্রেণীর সঙ্গে যোগাযোগ প্রশস্ত হচ্ছে না, সুদৃঢ় হচ্ছে না। অথচ সমাজ-জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রগতিবাদী প্রয়াসের সুযোগ বেড়েছে বই কমেনি।

আরও একটি লক্ষণ অস্বাভাবিক এবং প্রগতির পরিপন্থী বলে মনে হয়েছে। "হায়রে সেকাল!" বলে আক্ষেপ করলে প্রগতিবাদীরা বিরূপ হবেন। তবু সাহস করে বলা দরকার, প্রগতিবাদী দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত বটে, কিন্তু বারেবারেই প্রতিদিন পেছনে তাকিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে হিসাব করা দরকার, আমরা কোথা থেকে শুরু করেছি, কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি, অতীতের ভালোমন্দ ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করে আমরা বর্তমানকে উন্নত ক্ষেত্রে তুলতে পারছি কিনা।

একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়, অতীতে প্রগতিবাদী পুথিপত্র, কাগজের সংখ্যা যৎসামান্য ছিল। এখন ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচুর। তার বেশীর ভাগ অনুবাদ ও অনুকরণ, কিছু মৌলিক রচনা। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন এবং ইওরোপের নূতন গণতন্ত্রী দেশগুলির বইপত্র এখন অজস্র পরিমাণে সহজলভ্য। এটা একদিক দিয়ে লাভ। কিন্তু মনে হয়, এর ফলে প্রগতিবাদী লেখক ও পাঠকেরা দিগ্‌ভ্রান্তও হচ্ছে অনেকটা। আমাদের নিজেদের ভাবনা ও প্রয়াসের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। তৈরী মালমসলা আমাদের আলস্য এবং উদ্যমের অভাবকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। গুয়েতামালা, ব্রিটিশ গিয়ানা, কেনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শ্রেণী-শোষণের যাবতীয় বৃত্তান্ত আমরা অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারছি। কিন্তু ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানে গত সাত বৎসরে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে তার হিসাব-নিকাশ আমরা সামান্যই নিজের চেষ্টায় করেছি, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট, নিজেদের গবেষণা ও রচনা যৎসামান্য। গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় প্রগতিবাদী প্রচেষ্টা কিছু কিছু সার্থকতা পেয়েছে ঠিকই,

কিন্তু তারও আবেদন সীমাবদ্ধ ; স্বল্পসংখ্যক 'সহযাত্রী' পাঠক ও লেখকের গণ্ডি পার হ'তে পারে নি। আশঙ্কা হয়, আমাদের সমাজ-জীবনের বাস্তব ধারা অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও রূপায়ণ সম্বন্ধে প্রগতিবাদী লেখক ও পাঠকেরা আরও বেশী আদর্শনিষ্ঠ, আরও বেশী উদ্‌যোগী না হলে প্রগতিবাদ এক ধরনের 'মিস্টিক' ধর্মাচরণের চোরা বালিতে পথ হারাবে।

(১৯৫৫)

সমালোচকের সমস্যা

শরৎচন্দ্র নাকি একবার বলেছিলেন, ভালো কথা-শিল্পী হতে হলে ইক্-ভাগান্ত বই অনেক পড়া দরকার। অর্থাৎ সাহিত্যিককেও পলিটিক্স, ইকনমিক্স ইত্যাদি জানতে হবে। এরকম বাঁধাধরা বিধান চালান সম্ভব নয়, অনেকের কাছে আপত্তিকর হবে নিশ্চয়ই। আমরা অনেককাল ধরে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি যে, শিল্প-সৃজনী প্রতিভা কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। রুটিন বেঁধে পড়া, হিসেব করে লেখা এ নিয়ে সাহিত্য হয় না। কথাটা মূলতঃ ঠিকই, তবু শিল্পীকেও নিজস্ব ঝোঁক অনুসারে প্রতিভার অনুশীলন করতে হয়। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে শিল্পীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, সাধারণ পাঁচ-জন মানুষের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র সচেতন শিল্পীর গ্রহণ-ক্ষমতা। পলিটিক্স, ইকনমিক্স নিয়ম-মত পড়া বা না-পড়া আসল কথা নয়। 'শিল্প ও সমাজ', 'সমাজ ও সংস্কৃতি' ইত্যাদি বিষয়ে নানা গুরু-গম্ভীর আলোচনা করেও তাই কূল পাওয়া যায় না কী ভাবে শিল্প-সৃষ্টির ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় বা হওয়া উচিত। শরৎচন্দ্র যে কথা বলতে চেয়েছিলেন, সে হল এই যে, মানুষের জীবনের মূল সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সেগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল এবং বেদনা বোধ করা সাহিত্যিকের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ। সমালোচকের দায়িত্ব সাহিত্যিকের চেয়ে কম নয়। একথা অবশ্য আদর্শ হিসেবে বলা হচ্ছে। নতুবা সাম্প্রতিক কালে সমালোচনার দায়িত্ব যে ভাবে পালন করা হচ্ছে তাতে গৌরব বোধ করা যায় না।

সমালোচক বিচারক নন। কোনো সাহিত্য-প্রয়াসের মূল্য-নিরূপণ অবশ্যই সমালোচনার কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই মূল্য-বিচারের মানদণ্ড কে স্থির করবে? আদালতে যে বিচার হয় তার

বিধিবদ্ধ আইন আছে। সমাজ সেই আইনের স্রষ্টা। বিচারক তাঁর বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে ভালোমন্দ, দোষগুণ স্থির করেন, দণ্ড দেন অথবা পুরস্কৃত করেন। সাহিত্যের সমালোচনায় মূল্য-নিরূপণ এত সহজে হয় না। সমালোচকের সমস্যা হল, কোনো বইএর ভালোমন্দ তিনি কোন্ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করবেন। ভালো লাগা, মন্দ লাগা অবশ্য এক ধরনের বিচার। সাধারণ পাঠকও সে ধরনের বিচার করে থাকেন। শিক্ষা, রুচি এবং বিবেচনা দিয়ে ভালোমন্দ অনেক পরিমাণে বিচার করা যায় হয়ত। কিন্তু কেবল ভালো লাগা এই অনুভব দিয়ে সাহিত্যিক মূল্য স্থির করা যায় না, করা নিরাপদ নয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটুকরো এখানে বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ছাত্রজীবনের শুরুতে মারি করেলি, মিসেস্ হেনরী উড্, রাইডার হ্যাগার্ড এবং হলকেইনের উপন্যাস পড়ে মুগ্ধ, বিচলিত হয়েছিলাম। বিশেষ করে, হলকেইনের তীব্র ভাবোচ্ছ্বাসময় কাহিনী মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। আর অবাক হয়েছিলাম তাঁর এক একখানি বইএর লক্ষাধিক প্রচারের কথা শুনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গ হল, আঘাত পেলাম, যখন পরবর্তী কালে দেখলাম ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে হলকেইনের নাম উল্লেখ মাত্র করা হয় নি। মারি করেলিও ঐতিহাসিক মর্যাদার আসন পান নি। রাইডার হ্যাগার্ডের নাম ইংরেজী সাহিত্য-ইতিহাসের পাদটীকায়। আমি যে সময়ে হলকেইনের অনুরক্ত ছিলাম তখন সমালোচক হলে তাঁকে হার্ডি, গলস্‌ওয়ার্দির সমপদস্থ গণ্য মনে করায় আমার দ্বিধা হত না। তবে কেবল আমিই ওরকম ভুল করতাম না। ডেভিড গার্নেট সমালোচনার সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ঐ সময়ে হলকেইন সম্বন্ধে অনেক রসজ্ঞ লেখকই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সে প্রশংসা জলের আল্‌পনার মত সহজেই মিলিয়ে গেছে।

হয়ত সেরকম বিভ্রম আজও ঘটছে সাহিত্য সমালোচনায়।

আমাদের এখানে ত নিঃসন্দেহেই। সবটা দোষ সমালোচকের নয়। লেখক-পাঠক-সমালোচক এই তিনের সমাবেশে সাহিত্যের আসর সম্পূর্ণ। এর মধ্যে সমালোচকের স্থান ঠিক নির্দিষ্ট নয়, নিরাপদও নয়। বাংলায় এমন কোনো কাগজ নেই যা কেবলমাত্র সাহিত্য সমালোচনাকেই প্রথম স্থান দেয়। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্রে যে সব সমালোচনা বার হয় তা অধিকাংশই মামুলী ধরনের বিজ্ঞপ্তি এবং স্তুতি-মূলক। বিশ্লেষণ ও বিচারমূলক সমালোচনার স্থান একেবারেই নেই। লেখকেরা যে সমালোচনা ব্যাপারে খুব সহিষ্ণু তাও বলা যায় না। ফলে সমালোচকেরা অনেক সময়েই অপ্রীতিকর আলোচনা এড়িয়ে যান। কতকটা সংকোচ এবং ভীরুতা, অনেক সময়ে বন্ধুপ্রীতি অথবা গোষ্ঠীর আনুগত্য—এই সব কারণ মিলিয়ে সমালোচকের স্বাধীন সাহসিক কর্তব্য পালনে গুরুতর বাধা রয়েছে।

তাছাড়া অন্য কারণও আছে। বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে অনেকখানি ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে। এর সঙ্গে ইওরোপীয় নানা সাহিত্যের প্রভাবও কম নয়। অথচ সমালোচনা ক্ষেত্রে আমরা পেছিয়ে রয়েছি—ইংরেজী সমালোচকদের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, ঐতিহ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান এবং তার নিয়মিত অনুশীলন, এর কোনো কিছুই আমরা আয়ত্ত করি নি সযত্নে। যে কোনো লেখকের বই ভালো লাগলেই তার প্রশংসা আমরা এমন ভাষায় করে থাকি যেন এ বইএর আর তুলনা হয় না। অথবা লেখকের আন্তরিকতা, মৌলিকতা, রচনা-কৌশল ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করে সন্তুষ্ট হই, যা অন্য যে কোনো পাঁচজন ভালো লেখক সম্বন্ধেও করা যায়।

একই লেখকের আগে ও পরে, একই ধরনের বইএর গুণাগুণ নিয়ে বিস্তৃত এবং আদ্যোপান্ত আলোচনা কদাচিৎ হয়। আমাদের সমালোচনার মূল্য-নিরূপণ সম্ভবতঃ হয় সাময়িক জনপ্রিয়তা হিসেবে।

সমালোচকের কাজ যদি ঘটকালি হয়, তবে আমাদের সমালোচকেরা প্রায় সব কন্যাকেই অপরূপ সুন্দরী বলে পাঠকের কাছে উপস্থিত করছেন। তাতেও আপত্তি থাকত না, যদি সমালোচক এই সৌন্দর্যের বিশিষ্ট গুণাগুণের পরিচয় দিতে পারতেন। সমালোচনাও স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা পায় রসবস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের কৃতিত্বের জোরে। একটি উদাহরণ দিই ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যের একজন দিক্‌পাল, ম্যাথু আর্নল্ডের লেখা থেকে। টলস্টয়ের উপরে আর্নল্ড একটি প্রবন্ধ লেখেন। যে সময়ে লেখেন তখন টলস্টয় কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান, কিন্তু সে খ্যাতি আজকের মত সর্বজনীন স্বীকৃতির চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব পায় নি। আর্নল্ড প্রধানতঃ আলোচনা করেছেন টলস্টয়ের 'অ্যানা কারেনিনা' উপন্যাসখানির। বইখানার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ তিনি পড়েন, তখনও ইংরেজী অনুবাদ বার হয় নি। আর্নল্ড কেবল 'অ্যানা কারেনিনা'র প্রশংসা করে ক্ষান্ত হন নি। টলস্টয়ের ধর্মমত তাঁর শিল্পের উপরে কতখানি ছায়া ফেলেছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর্নল্ড নিজে সংশয়বাদী, টলস্টয়ের ধর্মমতকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তবু শিল্পী টলস্টয়ের অসাধারণ মানবচরিত্র অনুধাবন ক্ষমতা, তাঁর বাস্তবনিষ্ঠার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন আর্নল্ড। আর তার সঙ্গে দেখিয়েছেন ফ্লবেয়র প্রমুখ ফরাসী কথা-শিল্পীদের সঙ্গে টলস্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য কোথায়। আর্নল্ডের লেখায় শুধু টলস্টয়ের শিল্পপ্রতিভা নয়, 'অ্যানা কারেনিনা'র মূল্য-বিচার নয়, কথাশিল্পে বাস্তবতার রীতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে এবং সে আলোচনা আজও পড়লে মনে হয় তার সার্থকতা একবিন্দু কমে নি। এ রকম স্থায়ী সাহিত্যিক-গুণসম্পন্ন সমালোচনা বাংলায় সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কিংবা ম্যাথু আর্নল্ডের সমকক্ষ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা কাজের কথা নয়। কিন্তু সমালোচকের দায়িত্ব পালনের জন্য

প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। আর্নল্ডের কথার প্রতিধ্বনি করেই বলি, কেবলমাত্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে যথার্থ সাহিত্য সমালোচক হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ইক্-ভাগান্ত বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং থাকলে ভালো হয়। আবার বাংলা সাহিত্যের সমালোচক অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত না হলে মূল্য-বিচারে বাড়াবাড়ি ঘটবার আশঙ্কা থাকে। গল্প, উপন্যাস এবং কবিতার মূল্য-বিচারে আমরা সহজেই দিগ্‌ভ্রান্ত হতে পারি সাহিত্যিক প্রয়াসের সর্বজনীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হলে।

এরপর সমালোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে কথা। বঙ্কিমের রাজসিংহ পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিতোষ আবেগ্যদীপ্ত কাব্যময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা গদ্য কবিতার মত মনোরম, অপরূপ রোমান্টিকতার আলোয় ঝলমল। বঙ্কিমের রাজসিংহ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে নতুন সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের লেখা রাজসিংহ বঙ্কিমের কাহিনীকে সূত্র হিসেবে অবলম্বন করে আছে মাত্র। এখানে সমালোচনা সৃজনধর্মী। সমালোচনা মাত্রেই অবশ্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে না। পদ্ধতির বিভিন্নতা-বিচারে সমালোচনার ধারা নানা প্রকার—সৃজন-ধর্মী, অনুরাগী, বিশ্লেষণকারী এবং মূল্য-বিচারী। এর সঙ্গে ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক বিচারও উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ধরনের "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করার মত সমালোচনা আছে—যাকে বলা যায় ব্যাখ্যামূলক। "কবি এখানে বলিতেছেন যে" ইত্যাদি দিয়ে এই সমালোচনার শুরু এবং সাধারণতঃ নির্জলা প্রশস্তিতে এর শেষ। পরীক্ষা ব্যাপারে হয়ত এর মূল্য আছে, কিন্তু সমালোচনার মূল লক্ষ্য এবং দায়িত্ব ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা দিয়ে পূর্ণ হয় না।

সমালোচকের কর্তব্য হল প্রথমেই তিনটি প্রশ্ন স্মরণ রাখা—(১) লেখক কি বলতে চেয়েছেন, (২) লেখক যা বলতে চেয়েছেন

তা বলায় কতদূর কৃতকার্য হয়েছেন, (৩) লেখক যা বলতে চেয়েছেন তার মূল্য কি? প্রথম প্রশ্ন হল, যে কোনো লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে। সমালোচক তার স্বরূপ সন্ধান করবেন ও প্রকাশ করবেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল বাচনভঙ্গী অথবা প্রকাশ রীতি নিয়ে। এটি হল শিল্পগত উৎকর্ষ নির্ণয়। লেখকের স্টাইলের গুণাগুণ, মৌলিকতা অথবা গতানুগতিকতা নিয়ে সমালোচক তুলনামূলক আলোচনা করবার সুযোগ ব্যবহার করবেন। প্রথম প্রশ্নের আলোচনাতেও সমালোচক বিষয়বস্তুর তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করবেন। তৃতীয় প্রশ্ন হল মূল্য-বিচার। এই প্রশ্ন পুরোপুরি সাহিত্যিক অর্থাৎ শিল্পগত নয়। এখানে সামাজিক, ভাবনৈতিক এবং নৈতিক সবরকম বিচারই সম্ভব। তবে অবশ্যই সমালোচক এই বিচারে তাঁর নিজস্ব মতামত ও রুচির প্রয়োগে উদার এবং সহিষ্ণু হবেন। মতবাদের সংঘাত থেকে সাহিত্য কোনো কালেই মুক্ত থাকতে পারেনি, এখন ত এই সংঘাত জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। সমালোচকের কর্তব্য হল এই সংঘাতের মধ্য থেকে সুস্থ মানবিক সত্যের সন্ধান।

(১৯৫৫)

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচার

রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে কিছু আত্মসমালোচনা করলে মন্দ হয় না। নিজেকে ব্যক্ত করার প্রচ্ছন্ন অভিলাষও হয়ত এর মধ্যে থাকে। সে দুর্বলতা সব লেখকেরই। ভালো হোক, মন্দ হোক, লেখামাত্রই লেখকের নিজের কথা—নিজেকে প্রকাশ করবার তাগিদের কথা। তবে সব কথা সাহস করে বলা যায় না। কোনো কোনো সময়ে ত নয়-ই। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা এত সহজ এবং স্বাভাবিক আমাদের পক্ষে যে, তার পুনরুক্তি অনেক সময়ে অর্থহীন বিরক্তিকর হলেও কিছু করবার উপায় নেই। জন্ম-বার্ষিকী, মৃত্যু-বার্ষিকী, কবি-পক্ষ ইত্যাদি রকমারি উৎসব-অনুষ্ঠানে আমাদের বর্ষপঞ্জী ভরপুর। সম্প্রতি আবার স্থির হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আগামী বৎসরে পালন করা হবে। এটি মন্দের ভাল। অন্যদেশে খ্যাতনামা জ্ঞানী-গুণীদের স্মরণে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করাই নিয়ম, সাংবৎসরিক কোনো অনুষ্ঠান বড়-একটা দেখা যায় না। কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য বৎসরে বৎসরে লৌকিক অনুষ্ঠান করার সার্থকতা হয়ত আছে, তবে তা সামান্যই। শ্রদ্ধেয় অমল হোম মহাশয় তাঁর একটি প্রবন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, "যাঁরা রবীন্দ্রনাথের একপাতাও পড়েন নি, তাঁরাও আজ পাড়ায় পাড়ায় কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছেন রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে।" আপত্তিটা রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য নয়, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব নিয়ে মাতব্বরির বাড়াবাড়িটাই কপটতা বলে রুচিহীন এবং পীড়াদায়ক।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মত্ততা যতই বেশী হয়েছে, ততই যেন তাঁর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ বেড়ে চলেছে। অপরাধ রবীন্দ্রনাথের নয়,

আমার অথবা আমাদের। আর এইরকম নিরুৎসুকভাব কেবল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই আমার মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও মহোৎসবের কোলাহল যত বেড়েছে, ততই মন অসাড় বোধ করেছে। আবারও বলি—এর কারণ, রবীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপরে কোনো যৌক্তিক তত্ত্বগত বিরূপতার ফলে আমার চিত্তবিকার ঘটেনি। স্তবস্তুতির কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে, মাইকের বিকট আওয়াজে ধূপধোঁয়ার আবরণে ও পুষ্পাঞ্জলির চাপে এই সব আপনজনদের যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মেছি তারা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান। সকলেই আমরা কবি না-হ'তে পারি, এমন কি ভালোমত সাহিত্য-রসজ্ঞ নাও হ'তে পারি, তবু কৈশোর যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রতিপর্বে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছাকাছি থেকেছেন। এমন ইংরেজ দেখেছি যিনি বাল্যকালে শেক্সপীয়রের দু'এক টুকরো মাত্র পড়েছেন। তারপর শেক্সপীয়রকে সসম্মানে সরিয়ে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদের কারো মনোভাব এবং অবস্থা ঠিক ঐ রকম নয়—ঐ রকম হওয়ার উপায়ই নেই। আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে আছে নিজস্ব একটি রবীন্দ্রনাথ। যদি কখনও রবীন্দ্রনাথকে আমরা অতিক্রম করে যেতে চেষ্টা করে থাকি, তখনও তাঁর ভাব ও ভাষার অমিত ঐশ্বর্য আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ এখন স্কুল-কলেজে পরীক্ষার পাঠ্য। শিক্ষকসুলভ রীতিতে রবীন্দ্রনাথের লেখার ভাব-সংকোচ, ভাব-সম্প্রসারণ, ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদি এখন যথেষ্ট প্রচলিত হয়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছেন। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পনের বৎসর পরেও তাঁর একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হয়নি, হওয়ার উদ্যমও দেখা যাচ্ছে না। অথচ রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা মানে তাঁর একলার

কথা নয়, জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি পর্বের বিচিত্র বহু বিস্তৃত প্রয়াস ও কল্পনার বাস্তব কাহিনী। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার তুলনামূলক বিচার নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো একজন চিন্তাশীল সমালোচক সম্প্রতি বলেছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে, ইবসেন, টলস্টয়, টমাস মান, ইয়েট্স্ ইত্যাদির সমতুল্য নন। সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারের কোনো নির্ভরযোগ্য নিয়মকানুন নেই, তা থাকা সম্ভবও নয়। এমন কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই, যা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রতিভা ও সাহিত্য-কীর্তির তুলনা-গত মূল্যায়ন সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট, এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দু'জনের লেখা থেকেই বিস্তর নজীর দেওয়া যেতে পারে হয়ত। কিন্তু তুলনা কী ভাবে সার্থক ও যুক্তিগ্রাহ্য হবে, যদি দুই প্রতিভার পরিবেশ এবং প্রকাশ-পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য না থাকে? আরও একটি কথা। প্রতিভা যত বৃহৎ যত সৃজনশীল হোক না কেন, তার ভিত্তি হল সামাজিক পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। শেক্সপীয়র অথবা গ্যেটের প্রতিভা যে পীঠভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে আশ্রয় করেন নি—করা সম্ভবই ছিল না। রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুধারায় প্রকাশ ও পরিচয় শেক্সপীয়রের কবিকীর্তি অপেক্ষা কম মূল্যবান নয়। জার্মানীর জাতীয় জাগরণে, ভাষার রূপ-পরিবর্তনে গ্যেটের দান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথও এই বিচারে আমাদের কাছে অনন্যসাধারণ এবং বিশ্ব-সাহিত্যের ভূমিকায় গ্যেটের সমতুল্য। ইয়েট্স্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা হাস্যকর মূঢ়তা। কারণ, ইয়েট্সের কাব্যের সুর-ঝঙ্কার মধুর, অতিমাত্রায় মধুর এবং কখনও কখনও সেজন্য ক্লান্তিকর। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় আমরা একসঙ্গে নির্ঝরের কলধ্বনি এবং সমুদ্রের গম্ভীর কল্লোল শুনতে পাই। রবীন্দ্রনাথ 'অ্যান্না

কারেনিনা' লেখেননি বলেই টলস্টয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এমন অদ্ভুত বিচার সাহিত্যের নয়। অথচ টলস্টয়ের 'রেসারেক্‌শন' লেখা হবার বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর 'বিচারক' গল্প।

বিশেষ কোন একটি সাহিত্য-রীতিকে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করলে প্রত্যেক প্রতিভাকেই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ বলে রায় দেওয়া যায়। যেমন, কোনো কোনো সমালোচকমণ্ডলী একসময়ে অভিযোগ করেছেন, শেক্সপীয়র জনসাধারণের কবি নন, তিনি সম্ভ্রান্ত অভিজাতমণ্ডলীর সামাজিক আদর্শের সমর্থক। ফ্রয়েডীয় বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করলে হয়ত কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতিভারই লজ্জা রাখবার স্থান হবে না। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই—সব বড়ো প্রতিভার বেলাতেই একমাত্র সূত্র গ্রাহ্য হল, "তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে"। রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক হতে পারেন নি, "জীবনের যেসব অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতা" আঁদ্রেজিদ, প্রুস্ত, টমাস মান, রঁাবো এবং রিলকে তাঁদের সাহিত্যে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন—হয়ত একথাও ঠিক। মাদাম ক্যুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন, আইনস্টাইনের মত 'রিলেটিভিটি' তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেননি—এই উক্তি দিয়ে দু'জনের মধ্যে কারোর শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্ব প্রমাণ হয় না। রবার্ট হেরিকের ছোটো ছোটো গীতি-কবিতা জীবনের ক্ষণভঙ্গুর অভিজ্ঞতায় সমুজ্জ্বল, তবুও হেরিক কখনই মিল্‌টনের সঙ্গে তুলনীয় নয়, যেমন মিল্‌টন এবং শেক্সপীয়রের মধ্যে তুলনার ভিত্তিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অতি-আধুনিক অভিযোগের মূল হল যে, যৌন অভিজ্ঞতা এবং চিত্ত-বিকারের যাবতীয় রূঢ় সত্যকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। তার অর্থ মোটেই এ'নয় যে, তিনি জীবনকে অস্বীকার করেছেন অথবা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অতিমাত্রায় কল্পনামূলক ছিল। গল্পগুচ্ছে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পাই, তিনি কবি হলেও

জীবন-রসিক, মানব-প্রেমিক। নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ থেকে বলাকা ও পরিশেষ এবং তাঁর অন্তিমকালের কবিতাগুলিতে যে-রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ চেতনা ও বেদনার মহিমায় সমুজ্জ্বল, যে-রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র প্রবন্ধে, ব্যঙ্গ ও হাস্যকৌতুকে গভীর মননশীলতার আলোকে আমাদের জাতীয় চেতনাকে এখনও উদ্‌বুদ্ধ করছেন—তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্থায়িত্ব এমন সুপরীক্ষিত বাস্তব সত্য যে, কোনো তুলনামূলক বিচারেই তা খণ্ডিত হতে পারে না।

(১৯৫৫)

রবীন্দ্রোত্তর কাল

সাহিত্যের কাল-চিহ্ন সবসময়ে অর্থবোধক নয়; বিশেষ করে সমসাময়িক সাহিত্যের কাল-লক্ষণ নির্ণয় করতে যাওয়া দুঃসাহসিকতা। তবু সময়ের এক একটি পর্বকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর প্রায় বারো বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বারো বৎসরকে অনেকে হয়তো রবীন্দ্রোত্তর যুগ বা যুগের সূচনা বলে অভিহিত করতে চাইবেন। কিন্তু যুগ বলতে কতকগুলি সুদৃঢ়, সুনির্দিষ্ট লক্ষণ ও সেগুলির পূর্ণ বিকাশের সাক্ষ্য থাকা চাই। এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্ব এখনও ঠিক যুগ-হিসাবে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পারে না। হয়ত এই সময়টাকে রবীন্দ্রোত্তর কাল বলাই ঠিক—সময়ের বিপুল প্রবাহে নানা সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে; বিচিত্র, পরস্পরবিরোধী আবেগ ও কল্পনা, প্রয়াস ও প্রতিশ্রুতির ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আমাদের এই কাল মুখর, বেগবান। এটা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু কালপ্রবাহের মতই আমাদের এই সাম্প্রতিক সাহিত্য-প্রচেষ্টা অস্থির, চঞ্চল। তাই একে যুগ-হিসাবে চিহ্নিত করার সময় এখনও আসেনি। হয়ত সব কালেই সাহিত্যিক প্রয়াস এই রকম। তবে রবীন্দ্রনাথের যুগে সাহিত্য-ধর্মের একটা দৃঢ়ভিত্তি ছিল, মানস-কেন্দ্র স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেত, এটা আমরা অনুভব করেছি। সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের সকলের অনুভূতি এখনও এমন কোনো স্থিতি-স্থাপক ভিত্তিভূমি পায়নি। এ নিয়ে আক্ষেপ করার কারণ

নেই, এর জন্য সমসাময়িক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে লাভ নেই।

মাত্র বারো বৎসরের ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু থেকে। বারো বৎসর এই রবীন্দ্রোত্তর কালে আমরা কি হারিয়েছি এবং কি পেয়েছি তার হিসাব-নিকাশ করা সহজসাধ্য নয়। আরো একটা কথা—বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কালে যেসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার মূলে নিছক সাহিত্য সম্পর্কিত ভালো মন্দ, দোষ-ত্রুটি ক্রিয়া করছে না। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে আদর্শ-সংঘাত, মোহ ভঙ্গ অথবা নূতন মোহ সৃষ্টি—সব কিছু মিলে সাম্প্রতিক সাহিত্যের পটভূমি জটিল করেছে; জীবনে এবং সাহিত্যেও সঙ্কটের চেতনা তীব্র হয়েছে। কেবল সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যেরই লক্ষণ এটা নয়; যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে পৃথিবীর অনেক দেশেই সঙ্কটের তীব্র অনুভূতি সাহিত্য-জগৎকে নানাভাবে খণ্ডিত, বিভক্ত করেছে।

তবু মনে হয় অন্য দেশের সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রয়াস অনেক বেশী সুস্থ, আদর্শনিষ্ঠ। সাহিত্যিক গোষ্ঠীগত বিতর্ক ও বিবাদ চিরদিনই ছিল এবং থাকবে। আমাদের সাহিত্যিকেরা নিরুদ্যম হননি নানা বিপর্যয় এবং ভাব-সংঘাতের মধ্যেও। ই. এম. ফর্স্টার একবার রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, পরীক্ষা নিরীক্ষায় বাঙালীদের প্রবল উৎসাহ, ব্যর্থতায় তারা ভেঙে পড়ে না, কারণ বিশ্ব-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের স্বভাব। বিশ্ব-সমস্যার অর্থ অবশ্য রাজনীতি নয়—মানুষের সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্যা নিয়ে আমাদের সাহিত্যিকদের কৌতূহলের অন্ত নেই, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং অনেক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী। এ বিষয়ে রবীন্দ্রোত্তর কাল রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী।

রবীন্দ্রনাথ থেকে সময়ের হিসাবে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি বটে,

কিন্তু তাঁকে ভুলতে পারিনি, পারা সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই রবীন্দ্রোত্তর কালের সূচনা। ইংরেজী সাহিত্যে যাকে বলে 'পোস্ট শেক্সপীরীয়' যুগ সেই কালে শেক্সপীয়রের প্রতিভা ও শিল্প-কৌশল অনুকরণে, ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে অনেকখানি বিকৃত হয়েছিল। আমাদের রবীন্দ্রোত্তর কাল কিন্তু এদিক থেকে প্রায় দোষমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারত্ব সগৌরবে স্বীকার করেও আমাদের সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের রোমন্থনে মন দেননি। অনেকে হয়ত কল্পনা করে আনন্দ পান, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কী-ই না হত। এই কল্পনা রবীন্দ্রনাথের উপরে আমাদের অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন; পূর্বগামীদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের এটা একটা লৌকিক রীতিও বটে। মনে পড়িয়ে দেয় ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের প্রসিদ্ধ সনেটের আক্ষেপ—আহা, মিল্টন যদি আজ বেঁচে থাকতেন! যদি থাকতেন তাহলে ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের আশা পূর্ণ হত-ই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বর্নসের সমাধিস্থান দর্শনে গিয়ে স্কটল্যাণ্ডের সমসাময়িক রুচি-বিকার ও বিষয়ী সংকীর্ণতা দেখে কীট্‌স্‌ মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন, বর্নস বেঁচে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতেন দ্বিতীয়-বার। রবীন্দ্রোত্তর কালে আমাদের দেশের হালচাল দেখে রবীন্দ্রনাথ কী রকম অনুভব করতেন সেটা কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু কথাটা আমাদের সমসাময়িক কালের নিন্দা বা প্রশংসা নিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রোত্তর কালের কথা ভাবাই অসম্ভব। তাই বলে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল বোধ করাও হাস্যকর। রবীন্দ্রনাথ নেই বলে আমাদের সমস্ত সাহিত্য-প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ হচ্ছে, এরকম কার্যকারণযোগে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

প্রতিভার আবির্ভাব কোনও নিয়ম মেনে চলে কিনা, সেই দুরূহ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়ে পণ্ডিতদের বিতণ্ডা কোনো দিন শেষ হবে না। তবে প্রতিভার চাহিদা এবং যোগান ব্যাপারে প্রকৃতি বা সমাজের

মিতব্যয়িতা খুবই স্বাস্থ্যকর। প্রতিভা যদি উত্তরাধিকারসূত্রে বিবর্তিত হত, একের পর এক রবীন্দ্রনাথ কি শেক্সপীয়র সৃষ্টি হত, তাহলে অবস্থা ভয়াবহ হত, এতে সন্দেহ কি! বড়ো প্রতিভার কোনো সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত উত্তরাধিকারী নেই এবং সেইটাই যুগে যুগে সাহিত্যের বিচিত্র বহুমুখী প্রয়াসের পক্ষে উৎসাহপ্রদ, মঙ্গল-জনক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের পকেট সংস্করণ, বার্নার্ড শ'এর পর ক্ষুদে ক্ষুদে বার্নার্ড শ'এর আবির্ভাব, ভাবতেও ভয় করে। এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কাল মোহমুক্ত বলতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েও অনু-করণ ও রোমন্থনেই সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রয়াস নিঃশেষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ বিষয়ে পথ নির্দেশ করেছিলেন—নূতন কালের দাবিকে তিনি উপেক্ষা করেননি, তার আতিশয্য ও বিকারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সকলকে সাবধান করেছেন। কিন্তু তিনি ভোলেননি, একদিন তাঁকেও নূতন কালের পথ-মোচন করতে হয়েছিল, সাহিত্যিক স্থিত-স্বার্থের বিরোধিতা ও নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, মানুষের আবেগ ও চিন্তার বিশেষ দাবি ও প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন হয়; যে জীবন সহজ ও স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল তা হয়ত কালের প্রভাবে জটিল আবর্তময়, অস্থির হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে 'সোনার তরী' বা 'মানসী'র প্রাণোচ্ছল, অবাধ কল্পনাময় রূপটি আমাদের সাহিত্যে গভীরভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে না। কিন্তু যা হচ্ছে সবই নিষ্ফল কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো নয়, এরকম আক্ষেপ করার কারণ নেই। অবিস্মরণীয় প্রতিভা এমন নয় যে তার প্রভাব সর্বকালে সমান শক্তিশালী ও সজীব থাকবে। শেক্সপীয়রের নাট্য-প্রতিভা তুলনাহীন, অননুকরণীয়। শেক্সপীয়রের পরও নাটক লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। সে নাটক শেক্সপীয়রের নাটকের অনুরূপ গুণসম্পন্ন নয়,

কিন্তু সে নাটকও অনেক ক্ষেত্রে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, সমকালীন জীবন-বোধকে রূপায়িত করে স্থায়িত্বের মর্যাদা পেয়েছে। প্রাণধর্মের এই সাহিত্যিক প্রকাশ কখনও ঠেকিয়ে রাখা যায়নি, যাবে না।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল্য-বিচারে তাই রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র মানদণ্ড ধরে নেওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা, পর্ব থেকে পর্বান্তরে তাঁর স্বচ্ছন্দ উত্তরণ, সর্বজনীন এবং সমকালীন জীবন-বোধকে উদার মানবিকতার দৃষ্টিভূমি থেকে গ্রহণ করার ব্যাকুলতা তাঁকে আমাদের মানসক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দিয়েছে। সমসাময়িক কোনও সাহিত্যিকগোষ্ঠীই রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যেতে পারে না, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে এবং এগিয়ে যাওয়াটা কেবল কর্তব্য নয়, সাহিত্য এবং জীবনের ধর্মও। আমাদের সমসাময়িক সাহিত্য যে অনেক পরিমাণ সমস্যা-সচেতন হয়েছে তার মূলেও রয়েছে সেই গভীর জীবন-বোধ যা' রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অতিরিক্ত সমস্যা-সচেতনতা অবশ্য সাহিত্যের শিল্প-রূপকে অবহেলা করতে পারে, ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে তার নিদর্শন অপ্রচুর নয়। আবার সাম্প্রতিক বাস্তব চেতনা কোনো কোনো সাহিত্যিকের রুচি, প্রকৃতির অনুকূল নয়, তাই তাঁরা অন্তরাশ্রয়ী হতে বাধ্য হয়েছেন, জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুভূতি এবং তীব্র গভীর, সমস্যাসংকুল অভিজ্ঞতা দুই-ই তাঁদের কাছে সমতুল্য গণ্য হয়েছে; তাঁরা বেছে নিয়েছেন প্রথমটাই এবং নিছক ব্যক্তিগত অনুভব ও কল্পনা-বিলাসকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। কোন্‌টা ভালো এবং কোন্‌টা মন্দ, এ বিষয়ে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু সে অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য হবে না।

আসলে সাম্প্রতিক সাহিত্য-প্রতিভা ও প্রচেষ্টা নানা কারণে খণ্ডিত হয়েছে। এই খণ্ড-প্রতিভা ও প্রচেষ্টার শিল্প-মূল্য যাই হোক

না কেন, সর্বজনীন স্বীকৃতি তার স্বপক্ষে নেই। অতীতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বজনীন স্বীকৃতির প্রতীক। তিনি কেবল বিভিন্ন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর মিলনসূত্র ছিলেন না; যুগ পরম্পরায় তাঁর সাহিত্য-প্রয়াস সকল রকম নূতন ও পুরাতন ভাবধারার সঙ্গমস্থল হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর পর্বের প্রস্তুতি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ,এবং তৃতীয় দশক থেকে যেসব তরুণ বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে, তাঁদের আধুনিকতায়, বিদ্রোহপ্রবণতায় নিঃসন্দেহেই ভেজাল ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ঝোঁকটা আন্তরিক ছিল, যদিও বাস্তবতার দোহাই দিলেও তাঁরা অনেকেই জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারেননি।

একথা অস্বীকার করা যায় না, নাগরিক সভ্যতার, ঔপনিবেশিক সমাজের নিচুতলার নির্মম ভয়াবহ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমস্যা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যুগে সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে। কডওয়েল যাকে বলেছেন,

"Witches sabbath of bourgeois experience."

তাকে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছেন রবীন্দ্রোত্তর কালের কোনো কোনো সাহিত্যিক। সামাজিক বাস্তবতার যে প্রবল ঝোঁক চতুর্থ দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে গল্পে, উপন্যাসে ও কাব্যে দেখা গিয়েছে তার গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। এই ঝোঁক শিল্পরীতির বিচারে সার্থক, সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে, এরকম দাবি কোনো সাহিত্যিকই করবেন না। তবু লক্ষ্য করতে হবে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে কল্পনার পরিধিকে বিস্তৃততর করার প্রয়াস, গণজীবনের অনুভূতি, সমস্যা ও অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত ও প্রকাশ করবার চেষ্টা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হচ্ছে। আবার কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অথবা মতবাদ গ্রহণ না করেও কোনো কোনো সাহিত্যিক গল্পে এবং উপন্যাসে সার্থক শিল্প-সৃষ্টি করতে পারছেন, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত আশাপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ, বীরবলের পরেও বাংলা সাহিত্যে মননশীল কৌতুক-রসোজ্জ্বল প্রবন্ধ ও চরিত্র-চিত্র নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কার করতে পারে, এটা আমাদের প্রায় কল্পনাতীত ছিল। এক্ষেত্রে সফলতার কারণ কতকটা হয়ত আমাদের সাংবাদিকতার মান ক্রমশ উন্নত হয়েছে বলে। এছাড়া কোনো কোনো মননশীল লেখক বোধহয় সামাজিক সঙ্কটের গভীরতা উপলব্ধি করে আদর্শ সংঘাত থেকে মুক্ত থাকার জন্য 'স্টাইলের' উৎকর্ষ-বিধানে মন দিয়েছেন; পাঠকদের সমস্যা-ভারাক্রান্ত মনকে সব সমস্যার পাশ কাটিয়ে নূতন রসের আস্বাদ দিচ্ছেন। এই প্রচেষ্টা শিল্প-বিচারে অন্তঃসারশূন্য নয়, তবে সম্ভবত শিল্পীর আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির চিহ্নসূচক।

ছোটো গল্পে ও উপন্যাসে রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টিপ্রয়াসে ক্লান্তি বা ক্ষান্তির লক্ষণ নেই। বরঞ্চ নূতন ও পুরাতন লেখক অনেকেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনায় কৃতকার্য হয়েছেন, এ দাবি অন্যায্য নয়।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর কাল কিন্তু সার্থক হতে পারেনি; বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ, একথা বলাও দুঃসাহসিক হবে। সাম্প্রতিক কবিতা অনেক ক্ষেত্রে হয় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়ত অতিরূঢ়, গদ্যাশ্রয়ী এবং উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার সামিল। কবিতার যে অবিস্মরণীয়তা ভাব ও ভাষার পূর্ণ মিলনে, তার প্রতিশ্রুতি সাম্প্রতিক বাংলা কবিরা সামান্যই দিতে পারছেন। কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোনো 'ছুঁৎমার্গী' ধারণা নিয়ে এই অভিযোগ করা হচ্ছে না। জীবনের অতিসাধারণ অথবা রূঢ় বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে কবিরা বিস্ময়ের উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। তাঁদের এই স্বাধীনতা অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তাঁদের সেই বিস্ময়কে পাঠকের কাছে, শ্রোতার কাছে বিস্ময়কর আবেগ ও ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত করা চাই। কোনো সাম্প্রতিক

কবিতাই বিস্ময়করভাবে আবেগ ও ব্যঞ্জনাময় হচ্ছে না, একথা অবশ্য সত্য নয়। তবু সাধারণভাবে বলা চলে, সাম্প্রতিক কাব্য-ধারা 'পাবলিক পোয়েট্রি' ও 'পার্সন্যাল পোয়েট্রি'র আবর্তে ঘুর-পাক খাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আমরা আশা করে বসে নেই। মেনেই নিতে হবে আমাদের যুগ খণ্ড-প্রতিভার যুগ, কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, সবদেশের সাহিত্যেই—যেখানে আদর্শ-সংঘাতের ফলে শিল্পসৃষ্টির সর্বজনীন আবেদনের ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু গৌরবের কথা বলতে হবে, অনেক ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও, অতীতের মোহান্ধতা এবং সাময়িকতার ঘোর-লাগা বক্তৃতা-বিলাস সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কাল যেমন শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে চলেছে তেমনই নূতন প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ হয়েছে।

(১৯৫৩)

কাব্যের আনুগত্য

যে মন এবং অনুভূতি নিয়ে কবি কাব্য-রচনা করেন তার অনুরূপ মানসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রচেষ্টা কাব্যচর্চার প্রকৃত সোপান। অবিকল মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং অবিকল অনুভূতির তীব্রতা আয়ত্ত করা সহজ তো নয়ই, প্রায় সাধ্যাতীত বললেই হয়। কিন্তু অনুরূপ মানসিকতা ও অনুভূতি আয়ত্ত করাই সহৃদয় পাঠকের লক্ষ্য হবে। পাঠক কবি হয়ে হয়তো উঠবেন না; কারণ কবি হতে হলে প্রকাশ-ক্ষমতাও আয়ত্ত করা দরকার। পাঠককে ভাব-প্রকাশক না হলেও চলে, কিন্তু ভাবগ্রাহক হতে হবে।

'নীরব কবি' কথাটিকে অনেকেই বিদ্রূপ করেছেন। তার কারণও আছে। কবির বেলায় 'নীরব কবিত্ব' স্ববিরোধী কথা। কিন্তু সহৃদয় কাব্য-পাঠককে সম্ভবত 'নীরব কবি' বলাই সঙ্গত। তফাৎ শুধু এই যে কবি নিজেই কবি; কিন্তু পাঠক কবির সহায়তায় কাব্যের অনুগামী হয়ে তবে কবি, তাঁর সুপ্ত কবিকে জাগ্রত করে যখন তিনি কাব্য আস্বাদন করেন তখন সেই মুহূর্তে তিনি কবি।

সকলেই কি কাব্য আস্বাদনের অধিকারী? স্বল্প দু'চারজন বাদে প্রায় সকলেই অধিকারী। যাঁদের মধ্যে আদৌ কোন কাব্য-প্রবৃত্তি নেই তাঁদের কাছে কাব্যের সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের কথা বলা অবশ্য বৃথা; যেমন যাঁদের সঙ্গীতবোধ বা গানের কান নেই (এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম) তাঁদের কাছে গানের সুর—সৌন্দর্যের ব্যাখ্যান নিষ্ফল। অবশ্য অধিকাংশ লোকের মধ্যেই যেমন সঙ্গীতবোধ আছে, তেমনি কাব্যবোধও আছে

—হয়তো সুপ্তভাবে। এই সুপ্তবোধকে চর্চাদ্বারা অনেক পরিমাণে জাগ্রত ও পরিমার্জিত করা যায়। শ্রেষ্ঠ কাব্যের সংস্পর্শই সেই চর্চা। এক কথায় বলা যায়, কাব্যরস আস্বাদনের মধ্য দিয়েই কাব্যরসের স্বাদ পাওয়া যায়; কবিতা উপভোগ করতে করতেই আমরা কবিতা উপভোগ করতে শিখি, কাব্যরস আস্বাদনের অধিকারী হই।

কাব্যের মূল্যায়ন ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের কাছে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ, ব্যক্তিগত রুচি বা পছন্দকে ছেঁটে বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দেবার প্রশ্নও ওঠে না। কোন কবিতা কি উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে সে-সম্বন্ধে বহু পাঠক একমত হতে পারেন; কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কতোখানি সফল হয়েছে বা কবিতাটি কতোখানি সার্থক হয়েছে সে-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ না হওয়াই বরং অস্বাভাবিক। মিল্টনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবাদের জন্য অনেকের কাছে তাঁর কাব্য অপাঠ্য। আধুনিক যুগের অনেক পাঠক ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের অধিকাংশ কবিতা সহ্য করতে পারেন না, কারণ কবি এমন কতকগুলি ধারণা নিয়ে ব্যাপৃত যা তাঁদের কাছে হাস্যকর। কিপলিং, নিউ বোল্ট প্রভৃতি কবিদের সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম ও গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য তাঁদের কাব্যের অন্য অনেক সদ্‌গুণও পাঠকের কাছে অবহেলিত হয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায়, লোকে তাদের বিশেষ বিশেষ প্রিয় বিষয় নিয়ে রচিত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা পড়ে এবং আনন্দ পায়, কিন্তু তাদের অপ্রিয় বিষয় নিয়ে রচিত প্রথম শ্রেণীর রচনাও পড়তে চায় না। খুব কম লোকই আছেন যাঁদের সৌন্দর্যবিচার বা মূল্যবোধ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত রুচিনিরপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক পাঠকই সেই কবির সম্মান করেন যিনি তাঁর মনের কথা, তাঁর প্রিয় বিষয় বা ভাবকে প্রকাশ করেন বা করতে পারেন। কাজেই কেউ যখন বলেন, 'অমুক কবিতাটি বাজে' তখন তিনি যে কবিতাটির মূল্যাঙ্কন করেছেন তা নয়, তিনি বলতে

চাইছেন যে, 'অমুক কবিতাটি' তাঁর ভালো লাগে না বা পছন্দসই নয়।

কবি যে ভাব আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তা পৌঁছে দিতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি কিনা, তার উপর নির্ভর করে কবিতাটির সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের বিচার। কিন্তু এখানেও একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের নিজের অক্ষমতায় অনেক সময় আমরা কবির বা কবিতার ব্যর্থতা বলে মনে করতে পারি। পাঠক যদি কবির সঙ্গে সহযোগিতা না করেন তাহলে কবি কখনই তাঁর ভাব পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে পারেন না। মানসিক ক্ষমতা-অক্ষমতা এবং কিছু পরিমাণ জ্ঞান পাঠকের না থাকলে তিনি উৎকৃষ্ট কবিতাকেও 'অসার' বলে অভিহিত করতে পারেন। অনেক সময় কবিতা ভুল বোঝা হয়, কারণ পাঠক কবিতাটি বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা একটুও করেন না, অথবা পাঠকের কবিতাটি বুঝবার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তি বা বিষয়জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানের অভাব। কোন পাঠক কবিতা বুঝতে পারছেন না মানেই যে কবিতাটি দুর্বোধ্য তা না-ও হতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের ফলে শিক্ষার যেমন বহুল প্রসার ঘটেছে, তেমনি কাব্য-উপভোগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষতিও হয়েছে। আদিযুগের কাব্যের কথাগুলি ছিল 'শ্রব্য', এখন তা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'দৃশ্য'। কাব্য আর আমরা কান দিয়ে শুনি না, চোখ দিয়ে এবং মন দিয়ে শুনি। কিন্তু কবিতার মাধ্যম হচ্ছে কথা। কথার মধ্যে শব্দ ও অর্থ দুই-ই আছে। অর্থের যেমন মাধুর্য আছে, শব্দেরও তেমনি মাধুর্য আছে। অর্থ ও শব্দ-সম্ভার উভয় মিলে কাব্যরসের সৃষ্টি। কিন্তু ছাপাখানার যুগে কথার এই শব্দভাগ গৌণ হয়ে গেছে। ফলে একদিকে কাব্যের সজীবতাও যেমন কমে গেছে, অন্যদিকে তেমনি তার বুদ্ধিগ্রাহ্য হবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

কাব্যের মধ্যে সঙ্গীতময়তা কমে যাওয়ায় কাব্য নিঃসন্দেহে গরীব হয়ে পড়েছে। ছন্দ ও মিলের বৈচিত্র্য এবং ধ্বনির কারুকার্য থেকে প্রসাদগুণের সৃষ্টি হয়। শ্রোতৃ-গ্রাহ্যতার অভাবে তারও অভাব ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য কাব্যচর্চা প্রসঙ্গে কাব্যপাঠের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসার ঘটা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরেক ধরনের বিচার বা সমালোচনা আছে যাকে বলা যায় আঙ্গিকগত বিচার বা সমালোচনা, কাব্য রসাস্বাদনের জন্য এর প্রয়োজন এমন কিছু অপরিহার্য নয়। অবশ্য একটু উন্নত পাঠকের পক্ষে কবি কোন্ প্রক্রিয়ায় কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই আঙ্গিকগত সমালোচনা বা বিচারের জন্য বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন; পাঠক আঙ্গিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হলে কখনই এর বিচার করতে পারেন না।

আমরা যখন দোকান থেকে কোন জিনিস কিনি তখন অনুরূপ আরো দশ রকম জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে সেরা জিনিসটি বেছে নেবার চেষ্টা করি। কবিতার বেলায়ও আমরা তা করতে পারি এবং তাতে জিতবার সম্ভাবনাই বেশী। একই বিষয় নিয়ে রচিত বিভিন্ন কবির রচনা বা বিভিন্ন যুগের রচনা তুলনামূলকভাবে পাঠ করলে আমাদের কাব্য-স্বাদ গ্রহণের পরিধি বিস্তৃত হয়; রুচি মার্জিত হয় এবং উপভোগশক্তিও তীক্ষ্ণ হয়। ম্যাথু অর্ণল্ড বলেছিলেন যে, কাব্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে কিছু শ্রেষ্ঠ কাব্য আমাদের মনে রেখে দেওয়া উচিত এবং তাদের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই আমরা যেন অর্বাচীন কবিতার মূল্যায়ন করি।

ম্যাথু অর্ণল্ড নিজে সেই সেরা কাব্যের একটি তালিকা তৈরি করে তাঁর পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য অর্ণল্ডের বক্তব্য খুবই সঠিক। কিন্তু তিনি যখন তালিকা উপস্থিত করেন তখনই বাধে মুশকিল। কারণ কাব্য-উপভোগের পদ্ধতি

সকলের ক্ষেত্রে একরকম হয় না; হওয়া উচিতও নয়। কাব্য রচনার বেলাতেও সব কবির পক্ষেই যে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশেষ ধরনই আদর্শ হবে তাও নয়; এরকম সমতা আশা করাই অন্যায় এবং এরকম সমতার জন্য প্রচার বা আবেদনও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ-এর পক্ষে বিপজ্জনক। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের মতো লিখবেন বা নজরুল ভারতচন্দ্রের মতো লিখবেন এ কেউ আশা করে না। কাব্যের উৎকর্ষ অসংখ্য প্রকারে হতে পারে এবং কাব্যের প্রকারগত বৈশিষ্ট্যের অন্ত নেই। প্রত্যেক কবিই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং উৎকর্ষ সৃষ্টির পদ্ধতি বেছে নেন বা সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক পাঠকও তেমনি উৎকর্ষ বিচারের বিশিষ্ট পদ্ধতি ও মানদণ্ড বেছে নেন বা গড়ে তোলেন; তাঁর নিজস্ব তালিকা তিনি নিজেই মনে মনে স্থির করেন, অর্ণল্ড বা অন্য কারো তালিকা হুবহু গ্রহণ করেন না বা করা উচিতও নয়। তিনিই সচেতন পাঠক যিনি তাঁর নিজের বিচার পদ্ধতি বা আদর্শ নিজে গড়ে তোলেন এবং তাঁর নিজস্ব রুচির পরিবর্তন ও উৎকর্ষের সঙ্গে সমতা রেখে ক্রমাগত সেই পদ্ধতি ও আদর্শের পরিবর্তন সাধন করেন। কাব্য বিচারের মানদণ্ড বা আদর্শ যখনই অচল ও অনড় হয়ে ওঠে তখনই বিচার হয় নিষ্প্রাণ এবং রসাস্বাদশূন্য পণ্ডিতী মূল্যায়ন হয়ে ওঠে ধ্রুব আদর্শের মন্ত্রপাঠ করা ফাঁসির রায় মাত্র। তাতে কাব্যামোদ বৃদ্ধি পায় না, কাব্যামোদীরা উপকৃত হন না; কাব্য শুধু ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয় মাত্র।

কাব্যের প্রতি কবির আনুগত্য অন্য সবকিছুকে যেন ছাড়িয়ে যায়। এ আনুগত্য এতই গভীর যে মনে হয় কাব্য যেন তাঁর উপাস্য দেবতা, আর তিনি যেন সেবক। অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে তিনি কাব্যের সেবা করেন। হয়তো একটিমাত্র সার্থক কবিতা রচনার জন্যই তিনি বৎসরের পর বৎসর নিরলস কাজ করে যান; দারিদ্র্য, হতাশা, নিন্দা, স্তুতি, উপেক্ষা, কিছুই তাঁকে সঙ্কল্প ও

সাধনাচ্যুত করতে পারে না। শ্রেষ্ঠ কবির কখনো আত্মতৃপ্তি নেই। আরো ভাল কাব্য রচনার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট। যে বয়সে অন্য লোক কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে, কবি সে-বয়সেও কাব্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে ভয় পান না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চান—কলমের শেষ বিন্দু কালি দিয়েও—তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি কাব্যে নিয়োজিত করবেন। কবি যেন কাব্য-রণাঙ্গনের শহীদ! অবশ্য এখানে তাঁর যুদ্ধ নিজের সঙ্গেই। তিনিও মানুষ এবং তাঁরও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধেই যেন তাঁর সংগ্রাম।

কবিরা দায়িত্বশীল লোক। কিন্তু তাঁদের দায়িত্ব বা আনুগত্য দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত। অবশ্য তাঁদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে কাব্যের প্রতি। দেশপ্রেম, ধর্ম, নীতি, সমাজবাদ প্রভৃতির ভক্তরা প্রত্যেকেই দাবি করে থাকেন যে তাঁর বিষয়টি কবি গ্রহণ করেছেন এবং কথার জালে বুনে ব্যবহার করেছেন। কথাটা সত্য ও মিথ্যে দুই-ই। ব্লেক বলেছিলেন যে কবি মিল্টন শয়তানের বর্ণনা দিতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে নিজেই শয়তানের দলে ভিড়েছিলেন (was "of the devil's party without knowing it")—তার মানে এই নয় যে মিল্টন মানুষটি ছিলেন শয়তান। কবিরা মনে একটা স্বপ্ন বা আদর্শ বা ভাবলোক সৃষ্টি করে থাকেন, এই স্বপ্ন বা ভাবলোকের প্রতি আনুগত্যই তাঁদের কাছে সর্বপ্রধান। যখন কোন বাস্তব ঘটনা বা তত্ত্ব এই ভাবের বিরোধী হয়, তখন কবিরা —জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—ভাবের প্রতি আনুগত্যেই দৃঢ় হয়ে থাকেন, ঘটনার বা তত্ত্বের বা মতবাদের প্রতি নয়। রাজনৈতিক দল বিশেষকেও কবি অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন, কিন্তু দলীয় সভ্য হিসাবে তিনি খুব আদর্শস্থানীয় হতে পারেন না। দল নেতার বাস্তব কর্মসূচী লোকের সামনে তুলে ধরেন, তাঁরাও ভবিষ্যতের কথা বলেন কিন্তু বাস্তবের প্রতি বিশেষ নজর রেখেই তাঁরা সেগুলি

বলেন। কর্মসূচীর সঙ্গে তাঁদের নিজস্ব বিশেষ মতবাদ ও বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্যই তাঁদের কাছে প্রধান বিচার্য বিষয়। কাব্য কিন্তু দলীয় তত্ত্ব বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যকেই সর্বপ্রধান মনে করে না। সে রকম করানোর চেষ্টা কাব্যের প্রতি ক্ষতিকর। কবির আনুগত্য কাব্যের প্রতি। কাব্যের অন্তর্গত চিত্র, ব্যঞ্জনা, ভাব প্রভৃতি পরম্পরা সামঞ্জস্যবিধানই তাঁর লক্ষ্য। তা ছাড়া কাব্যের টেকনিকের প্রতিও তাঁর আনুগত্য আছে।

বর্তমান যুগে সমাজ বা রাষ্ট্রের দাবি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখন খুবই সংকুচিত। সমাজব্যবস্থার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় ব্যূহই মতবাদ বা ফর্মূলা বা সাধারণ-সূত্র দ্বারা বিধৃত; ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা প্রকাশের পক্ষে এর কোনটিই খুব অনুকূল নয়।

(১৩৬৪)

জর্জ বার্নার্ড শ

THE DEVIL. The truth is, you have—I won't say no heart; for we all know that beneath all your affected cynicism you have a warm one.

Man and Superman.

CLEOPATRA. No, no; it is not that I am so clever, but that the others are so stupid.

POTHINUS. [Musingly] Truly, that is the great secret.

Caesar and Cleopatra

আগের কথা পরে। জর্জ বার্নার্ড শ-র অসামান্য প্রতিভা এবং শিল্পসাফল্যের কথা পরে হবে। যে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে এদেশে এবং বিদেশে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, সে হল তাঁর সাহিত্যকীর্তির স্থায়িত্ব নিয়ে। রাষ্ট্রনেতার চেয়েও সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক গুণীদের পরীক্ষা বড়ো কঠিন—এক হল সমসাময়িক কালের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা; আর একটি হল চিরকালের অথবা ভাবী কালের দরবারে আসন পাওয়ার। ভাবী কাল অর্থাৎ 'পস্টারিটি' কি ভাববে, অনুভব করবে, কি বলবে, তা নিয়ে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কিছু দুর্বলতা আছে। অতীতের বহু মহৎ শিল্পকীর্তি অনেক শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে চিত্তলোকে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে; সেইসব চিরায়ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার দিকে তাকিয়ে স্বভাবতই আমাদের মনে হয়, আমরা যাঁদের ভালোবেসেছি, যাঁদের লেখায় বচনে ও কাজে গভীরভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছি, ভাবী কালে তাঁদের স্থান কোথায় হবে? 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র প্রশ্ন কেবল রবীন্দ্রনাথের মনেই জাগে

নি ; সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী সকলেরই মনে কখনো না কখনো স্পষ্ট অথবা অর্ধস্ফুটভাবে এই প্রশ্নের গুঞ্জরণ ওঠে। বার্নার্ড শ সম্বন্ধেও এরকম প্রশ্ন উঠেছে ; যেমন কবি য়েট্‌সের স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা কিছুকাল পূর্বে প্রখর হয়েছিল।

শ-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'ভিকি'র কার্টুনে শ বসে আছেন ঊর্ধ্বলোকে ; নীচে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছে পারমাণবিক বোমার আঘাতে, আর শ তাঁর বিখ্যাত 'মেফিস্টোফিলিস' ধাঁচের হাসি-হাসি মুখে যেন বলছেন, 'ওরাই আবার জিজ্ঞাসা করছে আমি টিকে থাকব কিনা—And they are asking whether I shall survive.' অবশ্য ওরা অর্থাৎ সাহিত্যানুরাগীরা শ-র স্থায়িত্বের প্রশ্ন আর পৃথিবীর পারমাণবিক বিলুপ্তির আশঙ্কাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখছে না। দেখলে হয়ত শ-প্রতিভার উপরে সুবিচার করা সম্ভব হত। কারণ গত এক শ বৎসরের মধ্যে তিনপুরুষকাল ধরে যদি কোনো ব্যক্তি প্রাচীনকালের 'প্রফেট'দের মতো মূঢ়তার বিরুদ্ধে, মহতী বিনষ্টির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সাবধানবাণী শুনিয়ে থাকেন তবে তিনি আর কেউ নন, একমাত্র জর্জ বার্নার্ড শ। তবু এ ঠিক উত্তর হল না শ-র স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের প্রশ্ন নিয়ে। এই প্রশ্ন অবশ্য একেবারে নতুন নয়, যদিও শ-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন করে এ নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

'দি শেভিয়ান' (*The Shavian*) পত্রিকা ক্ষুব্ধ হয়েছেন খাস ব্রিটেনে শ-র প্রতি উদাসীনতা দেখে ; মন্তব্য করেছেন, "য়োরোপের নানা স্থানে, মস্কো এবং এমনকি সুদূর পিকিংএ পর্যন্ত শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে [ভারতেও কলকাতা এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে] ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমনটি হয়, সেইরকম শেভীয় উৎসাহে ভরপুর। কিন্তু ব্রিটেনে 'ওল্ড ভিক'এর শ-অভিনয়ের পালা এবং আরো দু-চারটি অনুষ্ঠান ছাড়া যা হচ্ছে সে হল, শ-র উইল নিয়ে মামলা, তাঁর গ্রন্থস্বত্বের উপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি, তাঁর সর্বশেষতম

নাটিকাখানির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা এবং *Pygmalion* ও *Major Barbara* ফিল্ম দুখানির প্রদর্শন বন্ধ করা।” বার্নর্ড শ ‘স্মারক ভাণ্ডার’-এর উদ্‌যোক্তারা আবেদন জানিয়েছিলেন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহের জন্য; পাওয়া গেছে মাত্র ৪০৭ পাউণ্ড। দরিদ্র হলেও, নানা কারণে উদ্‌যোগ ব্যাহত হলেও, ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির জন্য এর চেয়ে অনেক বেশী করতে পেরেছে। এসবই হয়তো আনুষঙ্গিক ব্যাপার। শ-র প্রখর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ, তাঁর অনুরাগী লেখক চিন্তাজীবী শিল্পীর সংখ্যা ব্রিটেনেও এখনও নগণ্য নয়। বি. বি. সি. ‘থার্ড প্রোগ্রামে’ এবং টেলিভিসনে *Back to Methuselah* ও *The Devil's Disciple* অভিনীত হয়েছে শতবার্ষিকী উপলক্ষে; ডেম সিবিল থর্নডাইক তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের এক গৌরবময় মুহূর্ত ফিরিয়ে এনেছিলেন বার্নার্ড শ-র স্মরণে, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে গির্জায় Saint Joanএর মর্মস্পর্শী বক্তৃতাটি আবৃত্তি করে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রান্সে St. Maloতে *Caesar and Cleopatra* অভিনীত হয়; বিরাট ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে প্রাচীন চরিত্রের সঙ্গে শেভীয় হাস্যরস এবং বাক্যছটার সংমিশ্রণ ফরাসী এবং ইংরেজ দর্শকেরা ভালোমতই উপভোগ করেন।

এসব সত্ত্বেও শ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজ সমালোচকেরা শ-প্রতিভার স্থায়ী আবেদন এবং চিরায়ত গুণ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো একজন সমালোচক আশা দিয়েছেন, একপুরুষ পরে তরুণ লেখকেরা *Back to Methuselah* থেকে প্রেরণা সংগ্রহে উৎসুক হবেন। হয়তো এই মন্তব্যের মধ্যে সমসাময়িক কালের প্রতি কিছু শ্লেষ আছে। আমাদের এই যুগ আবেগজর্জর, প্রবৃত্তিতাড়িত, সমস্যাপীড়ায় দিশাহীন, প্রায় আশাহীনও। *Back to Methuselah*-র শেভীয় কল্পলোকে সব আসক্তি ও বাসনার সমাপ্তি; সেখানে কেবল বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুদীর্ঘ জীবন ধরে নিরাসক্তির সাধনা। শ নিজে পৌঁচেছিলেন প্রায় সেই পরম

প্রশান্তির স্বর্গে; তাঁর আয়ুষ্কাল শতাব্দীপূর্তির মাত্র ছ বৎসর পূর্বে হোঁচট খেয়ে অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেলেও জীবনের প্রান্তিক সময়ে তিনি Methuselah-র জ্ঞানবৃদ্ধের মতোই হয়েছিলেন আবেগহীন বুদ্ধির নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। তাই তাঁর সাফল্যের পরিচয়, পরাজয়েরও। পরাজয় নিশ্চয়ই, নতুবা মৃত্যুর মাত্র ছ বৎসর পরে শ-র স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। পরাজয়, কারণ শ বেঁচেছিলেন সুদীর্ঘকাল, তাঁর ব্যক্তিত্বের অসামান্য দীপ্তিতে, ক্ষিপ্রতায় মুগ্ধ করেছিলেন তিন পুরুষ ধরে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, চিন্তানায়কদের। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। কোনো কোনো সমালোচক হয়তো ঠিকই বলেছেন, এর জন্য ত্রুটি শ-র নয়। প্রথমতঃ তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভাধর; এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের আর যত শক্তিই থাক্-না কেন, কোনো বিরাট প্রতিভাকে বহন করা তার সাধ্যাতীত। বিরাট আদর্শ সংকল্প ও প্রয়াসের যুগ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, আর সে যুগের সমাপ্তি হয় বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। শ-প্রতিভার বিকাশ ও বিরাট সাফল্য মোটামুটিভাবে এই যুগটির মধ্যে সীমাবদ্ধ—১৮৮০ থেকে ১৮৮৩ হল শ-র সাহিত্যিক শিক্ষানবীসি; ১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রে প্রথম পাঠ, লণ্ডনের বস্তিতে পার্কে সভাসমিতিতে এবং সিডনি ও বিট্রিস ওয়েব প্রমুখ ফেবিয়ান সুহৃদদের সাহচর্যে; তার পরে ১৮৯৩এ *Widowers' Houses* থেকে ১৯২৪এ *Saint Joan* পর্যন্ত অন্তত ৩৭খানি নাটকে জি. বি. এস.-এর প্রতিভাদীপ্ত ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা। *Saint Joan*এর পরও শ-র অশ্রান্ত লেখনী ও অপূর্ব উদ্ভাবন-ক্ষমতা ক্ষান্ত হয় নি। *The Apple Cart* (১৯৩০)-এর প্রাণোচ্ছল হাস্যরসাশ্রিত কমেডি তারুণ্যের, তর্ক ও যুক্তির সুনিপুণ আঘাত-প্রতিঘাতের উদ্দীপনায় বিদ্যুৎময় গতিশীল। *Too True to be Good* (১৯৩৪), *On the Rocks*

(১৯৩৪), *Geneva* (১৯৩৯)-তেও জি. বি. এস.-এর অগ্নিবাণ লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। তবে শেষ যুগের এই জি. বি. এস. বড়ো বেশী পরিচিত; তাঁর বক্তব্য, বাচনভঙ্গী, নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের কৌশল সবই যেন প্রায় জানা হয়ে গেছে। নতুন কেবল সমসাময়িক সমস্যাগুলির নাটকীয় প্রতিফলন—গণতন্ত্রের সমস্যা ও সংকট, রাষ্ট্রপরিচালনায় বলপ্রয়োগের নীতিগত সার্থকতা, য়োরোপীয় রাজনীতিতে শক্তি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এর কোনোটিই জি. বি. এস.-এর প্রখর দৃষ্টি এড়ায় নি; জি. বি. এস.-এর মুখর ভাষণ ও ভাষ্যে অদ্ভুতভাবে এগুলির নানা অসংগতি ও প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, ভাব-সংঘাত সৃষ্টি করেছে। জি. বি. এস. পেয়েছেন নাটকীয় সাফল্য, ব্যর্থ হয়েছেন জর্জ বার্নার্ড শ।

শ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমালোচকেরা শেষ পর্যন্ত এই সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, অর্ধ শতাব্দী পরে য়োরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক-কতিপয়ের মধ্যে শ নিঃসন্দেহে স্থান পাবেন। সাহিত্যের মামুলী বিচারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে শেক্সপীয়রের পরেই বার্নার্ড শ-র স্থান। কন্‌গ্রীভ, শেরিডান, অস্কার ওয়াইল্ড প্রত্যেকেই নাট্যকার হিসাবে কিছু-না-কিছু কৃতিত্বের অধিকারী। কেউই কিন্তু বানার্ড শ-র সমকক্ষ নন নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যে; সংলাপের তীব্র তীক্ষ্ণ বৈদ্যুতিক স্ফুরণে ও ক্ষিপ্রতায়। ইংরেজী সাহিত্যের ঋণ আয়ারল্যাণ্ডের কাছে নিতান্ত কম নয়। তখনকার কালে রাজনৈতিক মর্যাদায় খাটো হলেও আইরিশদের কাছ থেকেই ইংল্যাণ্ড পেয়েছে এড্‌মণ্ড বার্ক এবং গোল্ডস্মিথকে, সুইফ্‌ট্‌, শেরিডান, অস্কার ওয়াইল্ড এবং বার্নার্ড শ-কে। আয়ারল্যাণ্ডের যে ভাগ্যতাড়িত তরুণটি জমিদারী সেরেস্তায় লোভনীয় খাজাঞ্চীগিরির চাকরি ছেড়ে ভিক্টোরিয়ার ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন ১৮৭৬এ, তাঁর অন্য কিছু সম্বল না থাক্‌, ছিল ছাই-চাপা প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ আর অদম্য আত্মবিশ্বাস।

'লণ্ডনকে কিছু শেখাতে হবে' (to educate London) এবং ইংরেজী সাহিত্যের রাজা হতে হবে, এই ছিল তরুণ বার্নার্ড শ-র সংকল্প। শ-প্রতিভার চিরস্থায়িত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়েও তাঁর শতবার্ষিকীতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর দুটি সংকল্পেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অনায়াসে অবশ্য নয়, দুস্তর সংগ্রাম করে। লণ্ডনকে শুধু নয়, সারা পৃথিবীকেই তিনি কিছু শিখিয়েছেন, ইংরেজী সাহিত্যের রাজতিলকও তিনি পেয়েছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে হার্ডি, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট, য়েট্‌স্‌, ব্রিজেস প্রভৃতি সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠদের মধ্যমণি ছিলেন বার্নার্ড শ। আর ইংরেজী ভাষার রচনাশৈলীতে শেভীয় দ্রুত কথনভঙ্গী, শ্লেষ ব্যঙ্গ তিরস্কারের সহস্রধার দীপ্তি ও স্বচ্ছতা যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে তা অনন্যসাধারণ, তার অনুকরণ প্রায় সাধ্যাতীত। শ-র নাটকের সংলাপ হল ক্ষিপ্রগতি, মুক্তছন্দ, ধ্রুপদী তালের; সাধারণ অসাধারণ সব চরিত্রই সমান বাক্‌পটু, নাটকীয় ভাবে অমিত-ভাষী, প্রগল্‌ভ; অথচ প্রত্যেকটি কথাই সুমিত, প্রসঙ্গ থেকে আলগা নয়, কখনো অনর্গল তর্কের খরস্রোতে প্রবহমান, কখনো বা একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। তাঁর নাটকের ভূমিকার রচনাশৈলীতে প্রসাদগুণ কতকটা অন্যরকম, এখানেও ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি, তবে যুক্তি আরো দৃঢ়সংবদ্ধ, নাটকের বিদূষকস্রষ্টা তাঁর ভূমিকায় দার্শনিক তর্কযোদ্ধা এবং প্রচারক। লণ্ডনকে তথা পৃথিবীকে কিছু শেখাবার সংকল্প শ কখনো ভোলেন নি। তবে শ-র নাটকের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে তাঁর প্রতি কিছু অবিচারও হয়েছে। অনেকের মতে শ তাঁর তত্ত্ব এবং বক্তব্য ভূমিকায় লিখেছেন প্রথমে এবং পরে তা প্রতিপাদনের জন্য নাটকের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেজন্য তাঁর সব নাটক ও নাটকীয় চরিত্রই তাঁর নিজস্ব মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ প্রথমে নাটকই লিখেছেন, ভূমিকার কথা চিন্তাই করেন নি এবং অনেক

ক্ষেত্রেই নাটক অভিনীত হওয়ার অনেক পরে তার ভূমিকা সংযোগ করেছেন।

শেভীয় নাটক যে রসোত্তীর্ণ, অভিনয়সাফল্য তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কালোত্তীর্ণ কিনা এই প্রশ্ন ঠিক স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হয় নি। প্রশ্ন যে উঠেছে তার একটি কারণ জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন জি. বি. এস.-এর চেয়ে অনেক মহৎ ও বৃহৎ। জি. বি. এস. হল জর্জ বার্নার্ড শ-র নাটকীয় পরিচ্ছদ। সেই পরিচ্ছদ অবশ্য কালক্রমে জর্জ বার্নার্ড শ-র শরীরে এমনই এঁটে বসেছিল যে, অনেক সময়েই শ-র সুস্থ মানবিক স্বরূপটি হারিয়ে যেত জি. বি. এস.-এর বেপরোয়া ভাঁড়ামি, অতিশয়োক্তি এবং নানা বিপরীতকথনের হতবুদ্ধিকর প্রকাশের মধ্যে। জি. বি. এস. এবং বার্নার্ড শ একই ব্যক্তি হলেও একাত্ম নন, একার্থক নন। জি. বি. এস.-এর প্রগল্‌ভতা কখনো কখনো অসহনীয় হয়েছে, কেবলমাত্র আমোদ পাওয়া এবং দেওয়ার উদ্দেশ্যে জি. বি. এস.-কে বুদ্ধির ফুলঝুরি ছড়াবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন বার্নার্ড শ, আর সেজন্য তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাধারণ লোকে মনে করেছে তাঁকে সুচতুর আত্মম্ভরি নাম-কা-ওয়াস্তে ক্লাউন। লর্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিও তাঁকে বলেছেন, 'অসাধারণ চতুর কিন্তু বিজ্ঞ নয়—Immeasurably clever but not wise'। ডেস্‌মণ্ড ম্যাকার্থির মতো অনুরাগী সমালোচক বলেছেন, শ-র মনোজগতে অসংখ্য স্বচ্ছ চিন্তার হুড়োহুড়ি, মহা বিশৃঙ্খলা—'chaos of clear ideas'। আমরা দূর থেকে যে বার্নার্ড শ-কে জানি তিনি হলেন তিন পুরুষের কিম্বদন্তী অথবা পৌরাণিক কাহিনী-চরিত্র—জ্ঞান-তপস্বী, বিদূষক-দার্শনিক এবং সমাজপ্রগতির শিল্পী-যোদ্ধা। আমাদের কল্পিত এই বার্নার্ড শ কিছুটা সত্য, আর কিছু পরিমাণে খ্যাতিমাহাত্ম্যে অতিরঞ্জিত। যেটুকু সত্য সে হল শ-র অনাড়ম্বর তপস্বীসুলভ জীবন, নির্ভীক ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রিয় সত্য কথনের ক্ষমতা। এই

বার্নার্ড শ-র তিরোধানে তাঁর নাটকীয় জি. বি. এস. জীর্ণ পরিচ্ছদের মতো কতকটা অনাদৃত হবেই তাতে সন্দেহ কি ? শেক্সপীয়রকে মনে করার দরকার হয় না শেক্সপীয়রের নাটকের রসাস্বাদনে। এদিকে ভল্‌টেয়ার, ডাক্তার জন্‌সন্ এবং বার্নার্ড শ-র ব্যক্তিত্বই প্রধান আকর্ষণ, এঁরা কি লিখেছেন তা না জেনে, না পড়েও এঁদের অস্তিত্বের প্রবল পরিচয় এবং ঐতিহাসিক বিস্তৃতি অনুভব করা যায়। শ-প্রতিভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু সান্ত্বনার আশ্রয় নিলেও কিন্তু শ-র প্রতি অবিচার করা হবে।

বার্নার্ড শ অথবা জি. বি. এস. কেউই শুদ্ধমাত্র দায়িত্বহীন 'ক্লাউন' ছিলেন না। পরিহাস হল শেভীয় প্রতিভা প্রকাশের আধার, সে আধারও শেভীয় শিল্পকৌশলে অনন্যসাধারণ গড়ন নিয়েছে। বোধ হয় বার্ক কোনো এক জায়গায় বলেছেন, 'যে খাবার পাঁজরে এঁটে যায় সেরকম খাবারই ইংরেজরা পছন্দ করে— The English like the food that sticks to the ribs'। আইরিশ বার্নার্ড শ সেইমতোই ইংরেজের জন্য তাঁর নাটকীয় ভোজ্যবস্তু তৈরি করেছিলেন। আরো একটি কারণ হয়তো আছে। ফেবিয়ান পিতামহ শ-র ব্রত হল, বুদ্ধি এবং যুক্তির নিপুণ প্রয়োগে মানুষের মনে চিন্তার বিপ্লব ঘটাতে হবে এবং সংঘর্ষ ও রক্তপাত বিনা সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। শেষ জীবনে শ এই পদ্ধতির উপরে অনেকখানি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের চেয়ে ডিক্টেটরশিপের প্রতি তাঁর ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। অনেক সময়ে তিনি ডিক্টেটরদের প্রশংসায় আতিশয্য দেখিয়েছেন। এর কারণ অবশ্য প্রতিভার খামখেয়াল মাত্র নয়। অসংখ্য পরস্পরবিরোধী আইডিয়ার আকর্ষণে ধাবমান হওয়া শেভীয় প্রতিভার স্বভাবধর্ম, তার পরিচয় তাঁর নাটকগুলির আইডিয়া-গত দ্বন্দ্বসংঘাতে হঠাৎ উল্টোপাল্টা পরিণতিতে। অধিকাংশ শেভীয় নাটকে ঘটনার সুপরিচ্ছন্ন কোনো ছক পাওয়াই

দুষ্কর ; শেখভের নাটকে যেমন ঘটনা ও চরিত্র-সমাবেশের জটিলতা, শ-র নাটকে তা নেই ; শেক্সপীয়রের যেমন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকাশের ধারা, তারও চিহ্ন সামান্যই শ-র আইডিয়া-আশ্রিত 'হাই কমেডি'তে। সোক্রেটিস নিশ্চয়ই নাট্যকার ছিলেন না, তবু তাঁর দার্শনিক কথোপকথনে নাটকীয় রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। সোক্রেটিসের কথোপকথন বিশ্বসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছে। বার্নার্ড-শ-কে বিংশশতাব্দীর সোক্রেটিস বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে ; তবে শেভীয় নাট্যপ্রতিভা সোক্রেটিক-গুণসম্পন্ন এবং সেইজন্যই শ-র শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির চিরস্থায়ী আবেদন নষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। *Man and Superman* (1903), *Back to Methuselah* (1921), *Saint Joan*, *Candida* (1898), *Major Barbara* (1907), *You Never Can Tell* (1898), *Pygmalion* (1916) ও *Caesar and Cleopatra* (1901) যেসব আইডিয়া আশ্রয় করে গড়া হয়েছে সেগুলি প্রায় সবই মানব-জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সংযুক্ত। শেক্সপীয়রের কিং লীয়র, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, মার্চেণ্ট অব্ ভিনিস এবং অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর ঘটনা এবং চরিত্রাবলী আধুনিক জগতের সঙ্গে আদৌ মেলানো যায় না ; তবু এই নাটকগুলির গঠনসৌন্দর্য, চরিত্র এবং ঘটনাসংঘাতের মূল মানবিক রূপটির আবেদন এখনো জীবন্ত। শ-র শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। যে আইডিয়া *Man and Superman*-এ অ্যান এবং ট্যানারকে আশ্রয় করে জীবনসৃজন-শক্তির লীলারহস্য প্রকাশ করছে, *Candida*-য় 'চিরন্তন ত্রিভুজটি'র যে পরিহাসোজ্জ্বল নব আবির্ভাব, মানবসভ্যতার পরিণাম নিয়ে যে সুদূরপ্রসারী কল্পনা *Back to Mathuselah*-তে বিধৃত, সেগুলির মানবিক আবেদনও যুগপরম্পরায় সজীবতা হারাবে না আশা করা যায়। শেভীয় নাটক মাত্রেই সাময়িক সমস্যা-মূলক নয়। *Pygmalion*, *You Never Can Tell* অথবা *Arms and*

the Man (1898)-এর অনাবিল হাস্যরস, রোমান্টিকতা এবং বাস্তবতার ঘাত-প্রতিঘাত, এসবই সাহিত্যের চিরন্তন গুণসম্পন্ন। তবু পঁচিশ বৎসর পূর্বে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস শেভীয় নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস অবশ্য দৃঢ়ভাবে নিজস্ব দুঃসাহসিক মত ঘোষণা করায় জি. বি. এস.-এর কাছ থেকেই গুরুমারা বিদ্যে শিখেছিলেন। চমৎকার চাঞ্চল্যজনক শোনায় তাই হ্যারিসের একক ঘোষণা—পঞ্চাশ বৎসর পরেও লোকে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া পড়বে, শ-র নাটক পড়বে না কেউ, শ-কে জানবে লোকে কেবলমাত্র রোঁদার গড়া অপরিচিত কোনো ব্যক্তির আবক্ষমূর্তি রূপে। হ্যারিসই বলেছিলেন, 'শ টিকবেন না; তাঁর দু-একখানা নাটক শেরিডান, কন্‌গ্রীভ, অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের পাশে জায়গা পেতে পারে, উপরে নয়। ইব্‌সেন যেমন আজ অচল হয়ে গেছেন, শ-ও তেমনি মারা যাওয়ার পর কুড়ি বৎসরের মধ্যে অচল হয়ে যাবেন।' ইব্‌সেনের কাছে শ ঋণী হলেও, শেভীয় নাটক ইব্‌সেনীয় আদর্শ এবং পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুকরণ করে নি। কেবলমাত্র সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক সৃষ্টি করলে সে নাটক কালক্রমে নীরস নিষ্প্রাণ দলিলের টুকরো হয়ে দাঁড়ায়, সে কথা শ ভালোমতোই জানতেন। *Man and Superman, Back to Methuselah, Saint Joan, Caesar and Cleopatra* সমসাময়িক চেতনার স্বাক্ষর বহন করলেও এই শেভীয় কমেডি শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডির মতোই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ এবং এই জগতের শেভীয় চরিত্রগুলি রোজালিণ্ড, অর্লাণ্ডো, বেনেডিক্, বিট্রিস ম্যান্‌ভলিও, অলিভিয়ার মতোই অবিশ্বাস্য, তাই চিরজীবীও—চিরজীবী শ্রেষ্ঠ শেভীয় চরিত্রগুলির আইডিয়াগত স্পন্দন ও মুখরতা। কোন্ নাটক কালের ধারায় তার অস্তিত্ব হারাতে পারে তা শ নিজেই ভালোমতো জানতেন।

আইডিয়ার প্রতি অনুরাগ এবং দারিদ্র্যের দুর্গতির প্রতি চরম ঘৃণা ছিল জর্জ বার্নার্ড শ চরিত্রের মৌলিক ও মহৎ মানবিক প্রেরণা। দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা তাঁকে বই পড়ে আয়ত্ত করতে হয় নি—বিত্তহীন বনেদী পরিবারের 'downstart' বার্নার্ড শ নিজের জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছিলেন, দারিদ্র্যই হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। ভল্‌টেয়ারের যেমন সংকল্প ছিল, 'দূর করো এই পাপ'—Erase the infamy, শ-র তেমনি সংকল্প 'দূর করো দারিদ্র্য'। ধনতন্ত্রের ছলনা ও বিকার, মধ্যবিত্ত মানসের রোমান্টিক ভাবালুতা, ভিক্টোরীয় যুগের অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলতা, সমাজের কর্তাব্যক্তিদের নীতিবাগীশ কপটাচার—এই সব জঞ্জাল থেকে মানুষের মনকে মোহমুক্ত করার কাজে প্রথম জীবনের বার্নার্ড শ হলেন রাজনৈতিক প্রচারক কর্মী ও সংগঠক; মধ্যজীবনে সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে নাটককে তিনি সামাজিক প্রগতির অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। শেভীয় কমেডির একটি অংশ তাই প্রচারধর্মী, চিন্তার জড়তা ও দাসত্ব থেকে মুক্তির মোহমুদ্গর। *The Widowers' Houses* এবং *Mrs. Warren's Profession* (1898) অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক নাটক; বস্তি এবং গণিকালয় চালিয়ে শতকরা ৩৫ ভাগ মুনফা নিয়ে সমাজের উপরতলায় সভ্যভব্য থাকা যায়, পরিবারের পবিত্রতা, স্বদেশপ্রেম, দানধর্ম সবই অনুশীলন করা যায় এবং এইসব ভালো জিনিস চর্চা করা যায় বলেই ধনতন্ত্রের উল্টো পিঠের বীভৎস রূপটা নজরে পড়ে না। সেই কথাটি চমকপ্রদ কায়দায় উল্টেপাল্টে নানা ঢঙে ও সুরে বলেছেন হেনরি জর্জ, মার্ক্স এবং জেভন্‌স্‌-এর মানস শিষ্য, ফেবিয়ান-গোষ্ঠীর পোষ-না-মানা মন্ত্রপ্রচারক বার্নার্ড শ। এই কথা বলার প্রয়োজন যখন ফুরোবে অথবা যদি ফুরিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই *The Widowers' Houses* এবং *Mrs. Warren's Profession*-এর মূল বক্তব্য পাঠক-দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করবে না। বস্তি এবং

গণিকালয়, শতকরা ৩৫ ভাগ মুনফার উপরে সভ্যতার চটক যখন নির্ভর করবে না তখন শ-র আজীবন সাধনার অনেকাংশ সার্থক হবে সন্দেহ নেই। শ নিজেই সে কথা বলে গেছেন তাঁর *The Widowers' Houses* নাটকখানির উদ্দেশ্য-প্রসঙ্গে: 'I heartily hope that the time will come when this play will be both utterly impossible, utterly unintelligible.' বস্তি এবং গণিকালয়ের ৩৫ পার্সেন্ট মুনফা ভোগ করার ভদ্র ব্যবস্থা এক সময়ে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, সমাজের মানুষের কাছে এই ব্যবস্থা একেবারে ধারণাতীত দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। শ-র কাছে এরকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা আনন্দেরই। ভিক্টোরীয় সমৃদ্ধির স্বর্ণলঙ্কায় নবাগত আইরিশ তরুণ বার্নার্ড শ এরকম মহৎ স্বাস্থ্যকর সামাজিক সম্ভাবনার চিহ্নমাত্র দেখতে পান নি। কেবল তিনি নন, দেখতে পান নি ডিজ্‌রেলি, যাঁর চোখে ধরা পড়েছিল 'মেরি ইংল্যাণ্ড' ভয়াবহভাবে দ্বিধাবিভক্ত, বিভক্ত দুই জাতিতে—এক হল ধনী, আর হল দরিদ্র। কার্লাইল দেখেছিলেন একই বৈষম্য, এবং সকল মানুষের মধ্যে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব-বোধের অভাব। কার্লাইলের চোখে ধরা পড়েছিল দুই শ্রেণী—এক হল 'ফুলবাবু', আর হল নিরানন্দ বিস্বাদ মেহনতের চাকায় বাঁধা জনসাধারণ—'Dandies and Drudges.' শ-র মানসপটে একই চিত্র খরতর হল হেনরি জর্জ এবং মার্ক্স অধ্যয়নের ফলে, শ্লেষময় ব্যঙ্গে বিচ্ছুরিত আলোকে উদ্ভাসিত হল তাঁর অনেক নাটকের সমাজদর্শন, ভাষ্য ও ভাষণ। গত পঞ্চাশ বৎসরে সমাজ-প্রগতির ফলে এইসব নাটকের সার্থকতা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। অন্ততঃ কোনো কোনো সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেট'-এ বস্তি ও গণিকালয়, দারিদ্র্যের চরম দুর্গতির প্রতি শেভীয় আক্রমণের এখন কোনো সার্থকতা নেই। এ যদি সত্যও হয় তবে তার জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব শ-র প্রাপ্য। তবে ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেট শ-র

নাট্যসাহিত্যে অর্থহীন করে ফেলেছে এতবড়ো দাবি করার সময় এখনো আসে নি। অন্ততঃ য়োরোপে ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেট যে বনিয়াদের উপরে গড়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে তাতে শ-র ভবিষ্যদ্-বাণীই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে মনে হয়। *Major Barbara*-র অ্যাণ্ডু আণ্ডারস্যাফ্‌ট্‌ সংকল্প করেছিলেন দারিদ্র্যের ঘৃণ্যতম পাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করবার। কামান বন্দুক বোমা বারুদের কারবারী আণ্ডারস্যাফ্‌টের সুসমাচার (gospel) হল, মানবমুক্তির জন্য চাই 'money and gun-powder ; freedom and power ; command of life and command of death.' আজকের য়োরোপের ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেট-এর হর্তাকর্তা-বিধাতারা আণ্ডারস্যাফ্‌টেরই মন্ত্রশিষ্য।

জি. বি. এস. নিজে অবশ্য কোনো নতুন মন্ত্র রচনা করেন নি। তিনি বিশেষভাবে কোনো একটি তত্ত্ব বা মতকে আশ্রয় করেন নি। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর সঙ্গে শ-র মৌলিক পার্থক্য এই একটি—ওয়েল্‌স্‌ও সামাজিক বৈষম্য এবং অসংগতি সম্বন্ধে সচেতন, তবে তিনি কখনো অজস্র আইডিয়াকে খুশিমতো প্রমাণ এবং অপ্রমাণ করতে উৎসাহী হন নি। শ-র মধ্যে ছিল একটি অস্থির সুচতুর তর্কসন্ধানী মন, আর সে মন অর্ধশতাব্দীরও উপরে বহু বিচিত্র আইডিয়ার পিছনে ছুটেছিল শেভীয় 'দুষ্ট'বুদ্ধির তাড়নায়। তরুণ বয়সের শ থেকে পরিণত বয়সের জ্ঞানবৃদ্ধ বার্নার্ড শ তাঁর বুদ্ধিকে পরিচালনা করেছিলেন একই অপরিবর্তনীয় ধারায়। একমাত্র সমাজবাদের মূল আদর্শের উপরে ছাড়া আর কোনো মত-বিশ্বাসে বোধ হয় শ-র হৃদয়গত অনুরাগ ছিল না। অন্য সব আইডিয়াই তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়, সমানভাবে বুদ্ধি ও ব্যঙ্গকৌশল প্রয়োগের সূত্রমাত্র। পিটার প্যান (Peter Pan) এবং পাক্ (Puck) এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শ-চরিত্র প্রতি পর্বে পর্বে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুঙ (Jung) বোধ হয়

বলেছিলেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি এবং সেগুলির জটিল যন্ত্রণা, ব্যাকুলতা, বিকাশ ও বিকার থেকে বার্নার্ড শ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এলেন টেরির সঙ্গে প্রণয়লীলার অভিনয় তাই অভিনয়ই, অন্তত শ-র দিকে; পিটার প্যান ও পাক্ বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে শ-কে ধরা যাবে না প্রেমের ছলনায়। এর চেয়েও মারাত্মক অথচ অসামান্য বুদ্ধির চপলতা স্টানব্রুকের মঠকর্ত্রী সন্ন্যাসিনী-মাতার সঙ্গে শ-র ব্যবহারে। শ-র *Saint Joan* পড়ে সন্ন্যাসিনী-মাতা মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রতিদিন শ-র কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। অতঃপর ঈশ্বর এবং স্টানব্রুকের সন্ন্যাসিনী-মাতা দুজনেই জানলেন শ-র চরিত্র স্বর্গীয় প্রার্থনার চেয়েও প্রবল; লেখা হল *Adventures of the Black Girl in Her Search for God* (1932)। শ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দাবি করলেন ঈশ্বরই তাঁকে এই বই লিখবার প্রেরণা দিয়েছেন; বুদ্ধির শানিত অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হয়েছে সব অলৌকিক মত-বিশ্বাস; তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও শেভীয় ব্যঙ্গ থেকে রক্ষা পায় নি। এ-হেন বুদ্ধিদর্পী প্রতিভাকে মত-বিশ্বাসের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা যায় না। তবে বুদ্ধিদর্পী হলেও শ নীরস নিভাঁজ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলা যায় না। জীবন-সৃজনশক্তির রূপকারের কল্পনায় মরমী অনুভবের স্পর্শ নিশ্চয়ই ছিল—*Man and Superman*, *Back to Methuselah*-য় তার কাব্যসুষমামণ্ডিত নিদর্শন অনেকই পাওয়া যায়। শ-র *Saint Joan* টি. এস. এলিয়ট-এর Becketএর চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশী ভগবদনুভূতিতে ভরপুর।

সুইস দার্শনিক দেনিস্ রুজমঁ্য বলেছেন, গত পঞ্চাশ বৎসরের য়োরোপীয় সাহিত্য হল 'নাশকতামূলক', subversive; উদাহরণ-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন ফ্রয়েড, জিদ্, প্রুস্ত প্রভৃতি চিন্তাজীবী সাহিত্যিক-শিল্পীদের নাম। বার্নাড শ-ও সাব্‌ভার্সিভ, কিন্তু আরো মহৎ ও বৃহৎ অর্থে। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় তিনি মৌলিক

কোনো তত্ত্ব অবতারণা করেন নি; মৌলিক হল তাঁর নির্ভীক বুদ্ধিগত আবেদন এবং নাটকীয়ভাবে সব বিশ্বসমস্যার সোক্রেটিক আলোচনা। তাঁর তর্ক এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ একাধারে সাব্‌ভার্সিভ এবং ক্রিয়েটিভ, নাশকতামূলক ও সৃজনধর্মী। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ এনেছে; জি. বি. এস.-এর অতিরঞ্জন, খেয়ালি-আতিশয্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে জি. বি. এস. এবং বার্নাড শ মূল সংকল্প সাধন সম্পর্কে কখনো দায়িত্বহীন নন; চেস্টারটন শ-র সমাজ-দর্শনের সমর্থক না হয়েও তাই বলতে পেরেছেন, শ-র দায়িত্ববোধে ইস্পাতের মতো টংকার -- 'his responsibility rings like steel'। শেষ জীবনে ডিক্টেটরশিপের প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেককে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ করেছিল। শ ছিলেন যাকে বলা যায় সমাজবাদের জনসংযোগকারী, 'Pubic Relations Officer'; সমাজবাদ যখন লেবর পার্টির হাতে ম্যাক্‌ডোনাল্ডী মুরুব্বি-ভক্তির শরণ নিল তখন ফেবিয়ান পিতামহ শ-র লেখনী স্বভাবতই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল। Apple Cart-এর আত্মম্ভরি কর্তাভজা কপট সমাজবাদী Boanarges হয়তো ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ব্যঙ্গানুকৃতি, হয়তো পরবর্তী কালের আর্নস্ট্ বেভিনেরও। কাজেই ফেবিয়ান তৃতীয় পুরুষের সাবধানী হিসাবী বুদ্ধিজীবীরা ফেবিয়ান পিতামহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এককালে শ-র *The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism* (1928) সমাজবাদকে জনপ্রিয় করেছিল; অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে লেখা *Everybody's Political What's What* (1944) উপেক্ষিত হয়েছে, তার একটি কারণ এই গ্রন্থে ফেবিয়ান শ মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। শ তখন অতি মহামান্য ব্যক্তি, super V. I. P. হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয় নি, কিন্তু চিন্তাজীবীরা সে

মতামত গ্রহণও করেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বার্নার্ড শ-র প্রখর উক্তি এবং যুক্তি বিশেষ কোনো সাড়া জাগায় নি, তার কারণ, য়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা সমাজবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, বিপ্লবের বিকৃত পরিণাম সম্বন্ধে নানা গভীর সংশয়ে পড়েছিলেন। 'ইউটোপিয়া' গড়ার বৈপ্লবিক উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় জি. বি. এস. তথা বার্নার্ড শ-র সমাজদর্শন অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হয়েছে। শ-র খ্যাতি, প্রভাব ও বুদ্ধিগত আবেদন হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ এই। দ্বিতীয়-যুদ্ধোত্তর কালের প্রফেট আর বার্নাড শ নন ; অর্‌ওয়েল এবং কেস্‌লার হলেন সমসাময়িক কালের জনপ্রিয় প্রফেট। শ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ধনতন্ত্রের অসংগতি, মূঢ়তা ও কপটাচারের বিরুদ্ধে ; অর্‌ওয়েল-কেস্‌লারের অভিযান হল সমাজবাদী বিকার ও অপচারের বিরুদ্ধে। মধ্যশতাব্দীর আধ্যাত্মিক সংকটের দোটানায় ফেবিয়ান পিতাসহ শ লক্ষ্যভ্রষ্ট কক্ষচ্যুত হন নি বটে, তবে তাঁর বিদ্রোহী-ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, মনে হয়েছে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শ-র চিন্তাধারার সংযোগ শিথিল হয়েছে। সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকা এবং অনর্গল কথা বলে যাওয়ার জন্য বড়ো প্রতিভাকেও বেশ কিছু জরিমানা দিতে হয়। শ-কেও দিতে হয়েছে। শেষ জীবনে শ তাই প্রায় নিঃসঙ্গ ; তাঁর অনেক কথাই হয় স্বগতোক্তি নয়তো পুনরুক্তি। হয়তো আগামী কালে তাঁর দুঃসাহসিক স্পষ্টভাষণ ও স্ব-বিরোধী প্রতিভা (অসংখ্য জি.বি.এস.-এর পরিহাসোজ্জ্বল পরস্পর-সংঘাত) নতুন পরিচয়ে সার্থকতা লাভ করবে। আমাদের কাছেও সেণ্ট বার্নার্ড তাঁর ব্যক্তিত্বে, জীবনশিল্পের সমারোহে, প্রাণশক্তির অজস্রতায় কম বিস্ময়কর, অর্থপূর্ণ নন। গুরু নয়, মন্ত্রদাতা নয়, সেণ্ট বার্নার্ডকে গৃহদেবতা হিসাবে গ্রহণ করাও কারো সাধ্য নয় ; শ হলেন মুক্তবুদ্ধির উদ্‌বোধক এ যুগের শেষ সর্বজনীন প্রতিভা। তাঁর জীবনই এক বৃহৎ মহৎ শিল্পকীর্তি, টল্‌স্টয় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মতো। কোনো

বাঁধাধরা বুলি, তত্ত্ববিশ্বাস অথবা সমস্যা-সমাধানের গুপ্ত মন্ত্রের জন্য বার্নর্ড শ-কে আশ্রয় করা কল্পনাতীত, অসম্ভব। প্রিস্ট্‌লে যাকে বলেছেন 'great cleansing winds of doctrine', সেই বিরাট প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধি ও মানবিক শুভচেতনার আবহাওয়ায় আমাদের ভাবনা-ধারণাকে নিরন্তর পরিশোধন করার প্রয়োজন এখনো আছে এবং থাকবেই। শ-র স্বচ্ছ বুদ্ধির অনুশীলন ও নির্ভীক প্রয়োগ সামাজিক এবং সাহিত্যিক ক্ষেত্রে করবার প্রয়োজন ভারতবর্ষে অন্তত ফুরিয়ে যায় নি। (১৩৬৩)

টমাস মান

টমাস মানের মৃত্যু হল আশি বছর বয়সে। প্রাচীনত্বে, প্রতিভায়, খ্যাতিতে 'গ্রেট' বলতে পারা যায় এমন একটি মনীষার অবসান ঘটল। কী ছিলেন টমাস মান তার পরিচয় দেওয়া সুসাধ্য নয়। আমাদের অনুভব ও ভাবের সঙ্গে টমাস মানের যোগাযোগ কোনো কালেই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমাদের মধ্যে যাঁরা যুবক কিংবা কিশোর ছিলেন তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন টমাস মানের 'বুডেন ব্রূক্স্' ও 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' পড়ে। মুগ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক, কল্পনার বিস্তৃতি ও বিশালতায়, নির্মাণ কৌশলে, অভিনব বিষয়মাহাত্ম্যে দু'খানি উপন্যাসই অতুলনীয়। কিন্তু কি হল টমাস মানের শিল্প-সাফল্যের কথা? 'বুডেন ব্রূক্স্'কে গল্স্ওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'র সমজাতীয় বলা হয়ে থাকে, কারণ দুয়েরই চিত্রপট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক উত্থান পতন বিপর্যয়, দুই-ই পরিবারিক পুরাণ। তবে সাদৃশ্য এই পর্যন্ত মাত্র। গল্স্ওয়ার্দির ফরসাইটদের পারিবারিক পুরাণের চিত্র আগাগোড়া এক-রঙা; টমাস মানের 'বুডেন ব্রূক্স্'-এর বর্ণ-সমারোহ যেমন বিচিত্র, তার স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে তেমনই নানা জটিল ভাবদ্বন্দ্বে বুদ্ধিদীপ্ত, অনুভূতি-গূঢ় অভিব্যক্তি। 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' তো নির্মাণ-কৌশলে, কাহিনী সংস্থানের অভিনবত্বে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি। তা'সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ-র সঙ্গে আমাদের যেমন সহজ আত্মীয়তা, টমাস মানের বেলায় সেরকম কখনও অনুভব করা যায় নি। বার্নার্ড শ, রমাঁ রলাঁ অথবা রবীন্দ্রনাথও বিস্ময়কর, অসাধারণ, কিন্তু তাঁরা সবকিছু মিলিয়ে ছিলেন মানুষের অতি

কাছাকাছি। টমাস মান মানবিকতাবাদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য, কিন্তু মানুষকে, জীবনকে তিনি সহজ মমত্ববোধে অভিষিক্ত করতে পারেন নি।

সমসাময়িক যুগের সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে অবশ্য অনুভব করা যায় কী বিরাট ছিল তাঁর প্রতিভা ও প্রয়াস, সংকল্প ও সাফল্য। টমাস মান তো কেবল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জার্মান কথাশিল্পী ছিলেন না। ইওরোপীয় মানসের সেই যুগের প্রতিভূ তিনি, যার পরিসমাপ্তি ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধে। কাইজার প্রথম উইলিয়ম ও বিসমার্কের আমলে ১৮৭৫ সালে জার্মানিতে যাঁর জন্ম· এবং মৃত্যু সুইজারল্যাণ্ডে এই ১৯৫৫ সনে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে, তাঁর জীবন ও শিল্পকীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্ধশতাব্দীরও বেশী ইতিহাস। আর সে ইতিহাস যে আশা-নিরাশায়, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে, সংগ্রামে, প্রতিরোধ সংকটময় ইতিহাস, তা কারো অজানা নেই। এই ইতিহাসের অঙ্গনে টমাস মান ঠিক কোন্ ভূমিকার অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে গবেষণা নিষ্প্রয়োজন। আমরা যাকে সমাজ-বাদী বাস্তবতা বলি তার প্রতি টমাস মান স্বভাবতই অনুরক্ত ছিলেন না। তিনি শিল্পী-যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু আর্টের জন্যই আর্ট এই মনোভঙ্গীও তিনি গ্রহণ করেন নি, না জীবনদর্শনে, না শিল্পকর্মে। শিল্পীর সৃজনীশক্তি, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে মান অজস্র আলোচনা করেছেন তাঁর নানা লেখায়। শিল্প সৃষ্টির জন্য শিল্পীকে সবকিছু ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, এই হল মানের প্রথম কথা। কিন্তু শিল্প হবে জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে, মানবিক সমস্যার সমাধানে সমর্পিত-প্রাণ, একথা তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন। যৌবনে শোপেন হাউয়ারের মহা-বিষণ্ণতার দর্শনে তাঁর দীক্ষা, পরিণত বয়সে গ্যেটের আশাবাদী জীবনবোধ তাঁর সাধনার লক্ষ্যস্থল—টমাস মানের এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী প্রবহমান চিন্তাধারার দ্বৈত লীলা তাঁর প্রতিভার আলো-আঁধারি

রূপকে অভিনবত্ব দিয়েছে। যখন প্রথম গল্প লেখা শুরু করেন তখন তাঁর ঝোঁক ছিল বিষয়ের চেয়ে আঙ্গিকের কলাকৌশলের দিকে। ফ্লবেয়র তখন তাঁর রচনা-শৈলীর আদর্শ। সে হল গত শতাব্দীর শেষ দশকে। কিন্তু টমাস মান একে জার্মান, তার উপরে বিত্তশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকট-চেতনা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই প্রখর হচ্ছিল। ফরাসী মেজাজের রূপ-সৌষ্ঠব নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হবে কি করে? নোভালিসের শিল্পদর্শনের প্রেরণা তাঁর কল্পনাকে রোমান্টিক রঙে অনুরঞ্জিত করল, শোপেন হাউয়ারের অনুশীলন জীবন-জিজ্ঞাসায় আনল প্রখর অনুভূতি, আর কাহিনী-রচনায় মিশল জটিল জীবনদর্শন। এই রোমান্টিকতার আলোছায়াময় ভাবের পরিমণ্ডল 'বুডেন ব্রুক্‌স্‌'-এর কথা বস্তুকে ঘিরে সৃষ্টি করল ভাগনারীয় সুরসঙ্গতি। 'বুডেন ব্রুক্‌স্‌' অতীতের স্মৃতিভারগ্রস্ত হলেও সুদূর স্বপ্নচারণ নয়। 'বুডেন ব্রুক্‌স্‌' টমাস মানের শ্রেণী-সংহার অথবা ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ। মানের প্রত্যেকটি উপন্যাসই এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ যার অস্তিত্ব সংকটময়, ক্ষয় এবং মৃত্যুর চেতনায় বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। স্রষ্টা হিসাবে মান এই জগতের ভাঙাগড়া সম্বন্ধে প্রায় নিরাসক্ত, তাঁর মানবিকতা-বোধ গভীর কিন্তু ঠিক সমবেদনাময় নয়। কিছু অনুকম্পার সঙ্গে দেবতা-সুলভ পরিহাসের দৃষ্টি নিয়ে তিনি মানুষের জীবনের বেদনা ও বিড়ম্বনার রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন। 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' টমাস মানের বিশ্বরূপদর্শন; এখানেও এক অদ্ভুত পরিমণ্ডলে বিচিত্র চরিত্র সমাবেশ, তত্ত্ব ও তর্কের অজস্র ধারা, নেপোলিয়নের যুগ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইওরোপীয় মানসের যাবতীয় সমস্যা ও জিজ্ঞাসার অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা। তবু বার বার মনে হয়, 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর সঙ্গে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার যোগ নেই, শিল্পী তাঁর সৃজন-ক্ষমতার প্রয়োগ-সাফল্যেই আত্মমগ্ন। 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' তত্ত্ব-প্রধান, এমনকি

নীতি-উপাখ্যান বলেও গণ্য হতে পারে। তবে টমাস মানের শিল্প-কৌশল অনন্যসাধারণ, যাদুকরী পাহাড়ের চূড়ায় 'এই কল্পজগৎ মানবিক আবেগে স্পন্দিত, চঞ্চল। মাটির পৃথিবীর সংশয়ক্ষুব্ধ মানুষের জগৎই যেন 'কনভেক্স' আয়নায় প্রতিফলিত। চরিত্র ও কাহিনীতে টমাস মান এমন গভীর আবেগ সঞ্চার করেন যে তারা ভাবের বাহন হলেও জীবন্ত। চিন্তাবস্তুর দিক থেকে 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এ টমাস মান এই পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে, জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর বিশুদ্ধ তত্ত্বে বা তর্কে পাওয়া যায় না। হান্স কাস্ট্রপকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন কর্মের ক্ষেত্রে, যাদুকরী পাহাড়ের সময়হীন রুদ্ধ-গতি ভাববিলাস থেকে। কাস্ট্রপের কর্মজীবনে দীক্ষা হল প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে। টমাস মান তখনও জার্মান 'কুলটুর'-এর মোহমুক্ত হন নি: জার্মান জাতি-গর্ব তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত। ১৯১৯ সনে তিনি 'অরাজনৈতিক' ব্যক্তি হিসাবে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে জনসাধারণের প্রতি তাঁর আস্থাহীনতা সুস্পষ্ট। তখনও তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থক।

এরপর জার্মানির তথা ইওরোপের রাজনৈতিক জীবনে যে ঝড় উঠল টমাস মানও তাতে মথিত, কেন্দ্রচ্যুত হলেন। হিন্ডেনবুর্গ লাইনের নিরাপদ আশ্রয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হল, বিপর্যস্ত হল টমাস মানের শিল্পী-স্বাতন্ত্র্য। মূঢ়তা ও বর্বরতার কালনৃত্যে গ্যেটের উত্তর-সাধক টমাস মানের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হল জার্মান কুলটুরের ঐতিহাসিক মরণান্তিক রূপ—বিসমার্ক থেকে হিটলার পর্যন্ত। 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর জীবন-দর্শন ও জীবন-জিজ্ঞাসা পিছনে পড়ে রইল, টমাস মানের শিল্প-চেতনায় নতুন রঙ ধরল। এখন আর জার্মান কুলটুর নয়, গ্যেটে-হাইনে-মার্কস-এঙ্গেলস ঐতিহ্য পরিপুষ্ট জার্মান সংস্কৃতির সর্বজনীন মানবিকতার অনুশীলন ও সম্প্রসারণ শুরু হল টমাস মানের জীবনে ও শিল্প-সাধনায়। তবু

টমাস মান টমাস মানই—তাঁর সমাজ-সচেতনতা যত প্রখরই হোক না কেন, শিল্পী-সত্তায় তিনি জন্ম-রোমান্টিক, তত্ত্বাশ্রয়ী, রূপকধর্মী তাঁর মননশীলতা।

জার্মান কুলটুরের হিটলারী অভিযানের বিরুদ্ধে, নাৎসী-ফ্যাসিস্ট ধূর্ততা ও সম্মোহের বিরুদ্ধে টমাস মানের অভিযান শুরু হল। সে অভিযান দৃপ্ত, মহৎ মানবিক বেদনায় উদ্‌বুদ্ধ, কিন্তু সেখানেও টমাস মান নিঃসঙ্গ পথচারী, সুদূর কল্পনাশ্রয়ী। তাঁর 'মেরিও দি ম্যাজিসিয়ান'-এ ফ্যাসিস্ট ছলাকলার প্রতি তীব্র বিদ্রূপময় আক্রমণ রূপকের রহস্যাবৃত। এরপর আঘাত এল হিটলার জার্মানি থেকে, জার্মানির শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর স্থান রইল না জার্মানিতে। 'সঙ্গীতও সন্দেহজনক'—নাৎসী-ফ্যাসিস্টদের বিদ্রূপ করে টমাস মান লিখেছিলেন 'মেরিও দি ম্যাজিসিয়ানে'। এই উক্তির যথার্থতা নাৎসীরা প্রমাণ করল টমাস মানকে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করে। নির্বাসিত হলেও পরাজিত হন নি টমাস মান। "যেখানে আমি থাকব, সেখানেই জার্মান সংস্কৃতি থাকবে," এ যুগের গ্যেটে—টমাস মান বলেছিলেন, আত্মগর্বে নয়, প্রবল আত্মবিশ্বাসে।

গ্যেটের উত্তরাধিকারী টমাস মানের জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল নির্বাসনে। ইওরোপের ঘনায়মান অন্ধকারের বিরুদ্ধে নাৎসী-ফ্যাসিস্ট বিভীষিকার রাজত্ব অবসানের সংকল্পে তারুণ্যের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হলেন টমাস মান। তাঁর জীবনে যতই পরিবর্তন ঘটুক, মান তাঁর স্বভাবধর্ম—শিল্পীর নিরাসক্তি থেকে বিচ্যুত হন নি। ফলে, তাঁর শিল্পী-সত্তা সমাজ-সচেতন হলেও শিল্প-সৃষ্টিতে বাস্তবের যথার্থ প্রতিফলন হয় নি ; তাঁর জীবন-দর্শন শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে দুরূহ তত্ত্বাশ্রয়ী। 'ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর কাস্‌ট্রপ যুদ্ধের কর্মোন্মাদনার মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার সমাধান সন্ধান করেছিল।

মান তাঁর শিল্পসৃষ্টির দ্বিতীয় পর্বে বাইবেলের জোসেফকে

আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেলেন সমাজ সংগঠনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার পথে। এই সময় টমাস মান ছিলেন আমেরিকায়। তাঁর কল্পিত জোসেফ কাহিনীর সামাজিক তত্ত্ব এবং আদর্শ মান গ্রহণ করলেন রুজভেল্ট ও মার্কিন 'নব-বিধান' থেকে। বাইবেলের জোসেফ কাহিনীতে সুদীর্ঘ জটিল রূপকের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংকট সমাধানের টমাস-মানীয় পথনির্দেশ—ধনতন্ত্রকে সহৃদয়, মানবকল্যাণ-ধর্মী করার মহান দায়িত্ব জোসেফের তথা রুজভেল্টের অথবা অন্য কোনো 'মহামানবের'। এই পথ ও তার পরিণাম আমাদের অজানা নয়। মানের সমাধান তাঁর আত্মমগ্ন শিল্পী-সুলভ মনোভঙ্গীর একক সমাধান। তবে টমাস মান কেবল একক নন, তিনি গভীর সংশয়ীও। গ্যেটের প্রশান্তি তাঁর সাধনার সামগ্রী, শোপেন হাউয়ারের মহা-বিষণ্ণতা ও অতৃপ্তি তাঁর শিল্প-চেতনার সর্বস্তরে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। রুজভেল্ট ও মার্কিন নব-বিধান তাই মানের মহৎ মানবিক বেদনাকে দৃঢ় আশ্বাস দিতে পারে নি। যুদ্ধান্তে আবার তাঁর মোহভঙ্গ ও ব্যাকুল জীবন-জিজ্ঞাসা। মানের অবলম্বন—রুজভেল্ট তখন লুপ্ত স্বপ্ন; ট্রুমান-আইসেনহাওয়ার-ম্যাক্‌কার্থীর 'নব-বিধান' তখন অন্ধকারের যুগ সূচনা করছে; টমাস মান ফিরে এলেন ইওরোপে। যুদ্ধোত্তর জার্মানি তাঁর চোখে অন্ধকারময়, বিস্মৃত, বিকৃত, দ্বিখণ্ডিত। কেস্‌লার, অর্‌ওয়েল, মাল্‌রোর মতো অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষে ইন্ধন যোগাতে টমাস মানের প্রবৃত্তি হয় নি। মার্কিনী নব-বিধানে ইওরোপে আবার নাৎসী-ফ্যাসিস্ট উদ্ভবের পীঠভূমি রচিত হচ্ছে জার্মানিতে, মান তা দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন; তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯৪৭ সনে লেখা তাঁর 'ডক্টর ফাউস্টাস' রূপক-ধর্মী উপন্যাস—জার্মান কুলটুরের ভয়াবহ মর্মান্তিক চিত্র এতে টমাস মান এঁকেছেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। বলা বাহুল্য পশ্চিম ইওরোপের বনেদী সাহিত্য

সমালোচকরা টমাস মানের এই উপন্যাসখানিকে পছন্দ করেন নি। টমাস মান কি তবে ঠাণ্ডা যুদ্ধে সোবিয়েত শিবিরের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন, এমন প্রশ্নও মার্কিন মহলে উত্থাপিত হয়েছিল। বোধ হয় ঠিক এই সময়েই টমাস মান বলেছিলেন, সুস্থ, সৃজনশীল সাহিত্য পশ্চিমে নয়, পূর্ব ইওরোপে রচিত হচ্ছে। এর উপরে পূর্ব-জার্মানি থেকে সম্মান ও অভিনন্দন গ্রহণ করাতে টমাস মানের বিরুদ্ধে প্রবল গুঞ্জন উঠেছিল পশ্চিম পাড়ায়।

টমাস মানের প্রতিভা ও সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা অবশ্য কোনো মতবাদের উপরে নির্ভরশীল ছিল না। 'বুডেন ব্রুক্‌স্' থেকে 'ডক্টর ফাউস্টাস' পর্যন্ত তাঁর শিল্প-প্রতিভার অবিরাম প্রয়াস বিশ্বাসে শান্তিতে ধাবমান হওয়ার, গ্যেটের আত্ম-সমাহিত প্রশান্তি অর্জন করবার। আত্ম-সমাহিত কিন্তু জীবন-বিমুখ নয়। ক্ষয় ও মৃত্যুর চেতনায় তাঁর অনেক লেখাই সকরুণ বিষাদময় কিন্তু মানুষের মহৎ প্রয়াসকে, সামগ্রিক জীবনের অগ্রসর হবার দাবিকে অশ্রদ্ধা তিনি করেন নি। সমসাময়িক অনেক ইওরোপীয় শিল্পীই জীবনের অসংলগ্নতা, তুচ্ছতা, মূল্যহীনতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সমষ্টিজীবন তাঁদের কাছে দুঃস্বপ্ন। টমাস মানের কল্পলোক অনুভূতি-গাঢ় বিষণ্ণতাময় হলেও মানবিক সত্যের মহৎ বেদনায় সমুজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। জীবন তাঁর কাছে কখনও অস্তিত্ববাদী মায়া মাত্র গণ্য হয় নি। তাঁর জীবনদর্শন অন্তঃশীল, কাব্যধর্মী কিন্তু জয়েস, প্রুস্ত, জিদের মত শূন্যগর্ভ, অসংলগ্ন উদ্দেশ্যহীন নয়। শিল্পীর নিরাসক্তির আদর্শ নানাভাবে বিকৃত হওয়া আমাদের কাছে নিন্দনীয়। তবে টমাস মান যে অর্থে নিরাসক্তিকে শিল্পীর অনুশীলনযোগ্য বলেছেন তার যথার্থতা একেবার উড়িয়ে দেবার নয়। শিল্প সৃষ্টির একাগ্র তন্ময়তাই নিরাসক্তি। সাময়িক কোনো আকর্ষণ শিল্পী-চেতনাকে আচ্ছন্ন করবে, বিধিবদ্ধ কোনো ফরমূলা সৃজনী আবেগকে সীমাবদ্ধ করবে—এর পরিণাম কি হতে পারে

তা নিয়ে যথেষ্ট ভাববার আছে। মানব-জীবনের যেসব গভীর সমস্যা টমাস মানের চিন্তাবস্তু ছিল তার সামাজিক মূল্য আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে। সমাজের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হলেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, জীবনের সঙ্গে পরিবেশের সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ধুয়ে মুছে যাবে, অনুরাগ ও বিরাগ, আশা ও ব্যর্থতার বিচিত্র প্রকাশের বেদনা থাকবে না বাস্তব জীবনে—এরকম অলৌকিক ধারণা আমাদের কিছু কিছু আছে। প্রবল বিশ্বাসের যেমন প্রয়োজন সুস্থ জীবনের উজ্জীবনে, তেমনি সংশয়ও একটি মহৎ মানবিক গুণ। টমাস মানের শিল্পকীর্তি বিশ্বাস ও সংশয়, গভীর জীবনবোধ ও গভীরতর অতৃপ্তি এই দুই মহৎ মানবিক গুণের অপরূপ ঐশ্বর্যমণ্ডিত। আমাদের সামগ্রিক চেতনায় এর মূল্য কোনো-না-কোনো দিন স্বীকৃতি পাবে এবং নতুন রস সঞ্চার করবে শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণায়। (১৩৬২)

———